গ্রন্থ পরিচিতি

পারিবারিক সহিংসতা সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। নারীর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, আইনের ফাঁক এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমাজে প্রচলিত সাধারণ ধারণা নারীদের পারিবারিক সহিংসতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন করে তুলেছে। কোভিড-১৯ সংকট এবং চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ এই সীমাবদ্ধতাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে বিবিধ সেবা গ্রহণ নারীদের জন্য আরও কঠিন হয়েছে।

এই গ্রন্থে পারিবারিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা বাংলাদেশের তিনটি জেলার বারো জন নারীর কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। অতিমারির সময় নারীদের জটিল বিচারিক পথচলা, নানান পরিস্থিতিকে সামলানোর কৌশলসমূহ, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করার মনোবল এবং আইনি সহায়তাকারীদের ভূমিকা এই কাহিনীগুলোর বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থটি গবেষক, শিক্ষার্থী, মাঠপর্যায়ের অনুশীলনকারী এবং পারিবারিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা নারী ও মেয়েদের সহায়তাকারীদের উদ্দেশ্য করে রচিত। এটি তাদের নিজেদের কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে ভাবতে এবং এ ধরনের কাজের গতি বাড়ানোর কৌশল পুনর্নির্ধারণে সহায়ক হবে।

YEARS

GERMANY-BANGLADESH
DEVELOPMENT COOPERATION

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT | giz | UKaid from the British people | bigd brac institute of governance & development | brac | blast ব্লাস্ট | আরডিআরএস বাংলাদেশ RDRS Bangladesh | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ন্যায়বিচারের সন্ধানে
পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের অব্যক্ত উপাখ্যান

ন্যায়বিচারের সন্ধানে

পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের অব্যক্ত উপাখ্যান

ন্যায়বিচারের সন্ধানে

পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের অব্যক্ত উপাখ্যান

গ্রন্থস্বত্ব© ২০২২ বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং রুল অব ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ

ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ: মার্চ ২০২২
বাংলা সংস্করণ প্রকাশ: জুন ২০২৩

গ্রন্থটি যৌথভাবে প্রকাশ করেছে

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
এস কে সেন্টার, জিপি, জ-৪ (টিবি গেট), মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
+৮৮ ০২ ৫৮৮১০৩০৬, ৫৮৮১০৩২০ | info@bigd.bracu.ac.bd; bigd.bracu.ac.bd

রুল অব ল প্রোগ্রাম

জিআইজেড বাংলাদেশ, পিও বক্স ৬০৯১, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
giz-bangladesh@giz.de; www.giz.de/bangladesh

সহায়তায়

জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড) এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)

গবেষক দল

মাহীন সুলতান, সিনিয়র ফেলো অব প্র্যাকটিস, বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
মারুফা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক, গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (জিএসজি) বিভাগ
ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (আইইউবি)
প্রজ্ঞা মাহপারা, জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী, বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
নূহা আননূর পাবণী, গবেষণা সহযোগী, বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ফারিহা তাসনিন, গবেষণা সহযোগী, বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আইনি বিশ্লেষক দল

সারা হোসেন, অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট
আবদুল্লাহ তিতির, গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট
ইসরাত জাহান সিদ্দিকী, গবেষণা কর্মকর্তা, ব্লাস্ট
সাদীউল ইসলাম অন্তর, গবেষণা কর্মকর্তা, ব্লাস্ট

বাংলা অনুবাদ

খলিলউল্লাহ্ জীবন

ছবি | ফাহাদ কাইজার
প্রচ্ছদ ও নকশা | মো. আব্দুর রাজ্জাক

মুদ্রণ | কালার লাইন

উদ্ধৃতি নমুনা

Sultan, M., Akter, M., Mahpara, P., Pabony, N. A., Tasnin, F., Hossain, S., Titir, A., Siddiki, E. J., & Antor, S. I. (2022). In search of justice: Untold tales of domestic violence survivors. BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University & Rule of Law Programme, GIZ Bangladesh.

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	১
২.	কেসসমূহ	১৭
ক.	সারা রাত তালাবদ্ধ: আফরোজা	১৯
খ.	তালাকপ্রাপ্ত এক নারীর বিপন্নতা: দিলরুবা	২৭
গ.	আমার সন্তানের এখন কী হবে —ফাতেমা	৩৭
ঘ.	আমার গড়া ঘরে আমারই কোনো অধিকার নেই —রিনা	৪৭
ঙ.	একজন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিয়তি: মিতা	৫৭
চ.	তার মা মনে করেন সে আর আগের মতো নেই: সাদিয়া	৬৫
ছ.	তাকে জেলে ভরতে না পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না — কমলা	৭৩
জ.	ভুলে যেতে ও ক্ষমা করে দিতে প্রতারণা: রূপা	৮৩
ঝ.	বেশি কথা বলার অভিযোগ: বিউটি	৯৩
ঞ.	তারা আমার সন্তানকে দেখতে দিতেন না —মীনা	১০১
ট.	আমি আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাই —রেশমা	১০৯
ঠ.	আমি যদি আবার ফিরে যাই, তাহলে লাশ হয়ে ফিরব —আয়েশা	১১৭
তথ্যসূত্র		১২৭
শব্দকোষ		১২৯
পরিশিষ্ট: আইনি ভাষ্য		১৩১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০২২ সালে বাংলাদেশ-জার্মানির উন্নয়ন সহযোগিতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের অংশীদারত্বের স্মারক এই গ্রন্থ। পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জটিল ন্যায়বিচার-সন্ধানী অভিযাত্রার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এখানে। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংগঠনের সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা করা সম্ভব হতো না। মূল্যবান অবদানের জন্য তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

তিনটি অংশীদার সংগঠনের কাছে গবেষণা দল কৃতজ্ঞ: বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা সেবা (এইচআরএলএস)* এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ। এসব সংগঠনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীরা মাঠ গবেষণা সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, জ্ঞান ও সময় দিয়ে গবেষণায় অবদান রেখেছেন। আইনবিষয়ক মন্তব্য ও অবদানের জন্য ব্লাস্টের সহকর্মী আয়েশা আকতার, মো. বরকত আলি, শারমিন আকতার, সিফাত-ই-নূর খানম, শিপ্রা গোস্বামী এবং তাপসী রাবেয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিআইজিডির কমিউনিকেশন টিম, বিশেষ করে জেরিন আনান খন্দকার এবং ফটোগ্রাফার ফাহাদ কাইজারকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সহায়তায় পরিচালিত জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অব ল প্রোগ্রাম এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। গবেষণা ও এই গ্রন্থের প্রকাশনা এগিয়ে নিতে তাদের পলিসি ও রিসার্চ ইউনিট এবং কমিউনিকেশন টিমের চমৎকার দিকনির্দেশনা আমাদের দারুণভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়াও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসের লিগ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান ড. ফস্টিনা পেরেইরা এবং বিআইজিডির গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিটিকস ক্লাস্টারের প্রধান ড. মির্জা এম হাসানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণা প্রতিবেদনের প্রথম ধাপের নকশা ও বিশ্লেষণে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। এই গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ সম্পাদনে জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অব ল প্রোগ্রামের সদস্যরা সহায়তা করেছেন। সবশেষে, যেসব নারী আমাদের কাছে নিজেদের কাহিনী, অভিজ্ঞতা, আনন্দ ও বেদনা জানাতে সময় দিয়েছেন এবং ধৈর্য রেখেছেন, তাদের এবং তাদের পরিবারের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

* সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড লিগ্যাল প্রোগ্রাম (এসইএলপি) হিসেবে পরিচিত

রিনার বাবা আরডিআরএসের একজন কমিউনিটি অ্যানিমেটরের সঙ্গে কথা বলছেন।

১. ভূমিকা [১]

পটভূমি

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা একটি সর্বব্যাপী বিষয়। সুরক্ষা ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা নির্মূলের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। অনেক সময় নারীদের আর্থিক সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে না। তাছাড়া উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার নেই। বেশিরভাগ নারীরই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মতি ও পছন্দের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সীমিত। বিয়ে, সংসারজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার নেই। সন্তান জন্মদান ও সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রেও তাদের সমান অধিকার নেই। করোনা অতিমারিতে এসব চ্যালেঞ্জ আরও বেশি বেড়েছে। কারণ, এ সময় চলাচলের নিষেধাজ্ঞা ও লকডাউন থাকার ফলে আইনি সেবাসহ সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেবাপ্রদান প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—কমিউনিটিভিত্তিক আইনি সেবা ও প্যারালিগ্যাল সেবা প্রদানকারীরাসহ বিজ্ঞ আইনজীবীরা লকডাউনের সময় কার্যক্রম বন্ধ রেখেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল লকডাউন কার্যকর করা। সরাসরি ও ভার্চুয়ালি দুই ধরনের আদালতই তখন মূলত জামিনের শুনানি ও আদেশ প্রদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পারিবারিক সহিংসতা বা পারিবারিক বিষয়াবলির শুনানি খুব কমই হয়েছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ‘করোনাকালে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ’ শিরোনামে একটি গবেষণা করেছে। জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড

[১] ভূমিকা লিখেছেন মাহীন সুলতান, সারা হোসেন এবং মারুফা আক্তার

ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে জিআইজেড বাংলাদেশের রুল অব ল প্রোগ্রাম এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস এই গবেষণায় সহায়তা প্রদান করেছে। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে তিনটি এনজিওর সহযোগিতায়– ব্র্যাক, ব্লাস্ট ও আরডিআরএস। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিবেদন (Sultan et al., 2021a) এবং একটি নীতি-সারসংক্ষেপও (Sultan et al., 2021b) করা হয়েছে।

মূল গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল ২০২০ সালের নভেম্বর এবং ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যবর্তী সময়ে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল—অতিমারিকালে ন্যায়বিচারের সন্ধানে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের অভিজ্ঞতা, তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতি, কীভাবে তারা বৈরী পরিবেশ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেছিলেন এবং ন্যায়বিচারের সন্ধানে তাদের জটিল অভিযাত্রা বোঝার চেষ্টা করা। এই গবেষণার আরও উদ্দেশ্য ছিল—সীমিত শিক্ষা ও আর্থিক সংস্থান থাকা বিপন্ন বিবাহিত নারীদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখা। এসব নারী তাদের স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং আইনি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সহায়তা চেয়েছেন। করোনা মহামারির কারণে নানান প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তিনটি আইনি সেবাপ্রদানকারী এনজিও তাদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এই এনজিওগুলো অনলাইন সেবা ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল চাহিদার প্রেক্ষাপটে হেল্পলাইনের সুবিধা বৃদ্ধি এবং সরকার ও এনজিওগুলোর মধ্যে সহযোগিতাকে বৃদ্ধি করা। এসব এনজিওর সেবাগ্রহীতা, কমিউনিটি এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে থাকা বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ও সম্পর্কের কারণে তারা অতিমারিকালে সহায়তা চালিয়ে যেতে পেরেছে। এই গবেষণায় পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তায় এসব এনজিও কীভাবে এগিয়ে এসেছে, তা বর্ণিত হয়েছে।

বিস্তৃত গবেষণা থেকে এই গ্রন্থে বারোটি কেস স্টাডি সংকলিত হয়েছে। এখানে করোনা অতিমারির সময়ে প্রত্যেক নারীর ন্যায়বিচারের জটিল অভিযাত্রাকে গভীরভাবে তুলে আনা হয়েছে। কেস স্টাডিগুলো রংপুর, ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালী—এই তিন জেলাভিত্তিক। কেস স্টাডিগুলোর উদ্দেশ্য হলো—একাডেমিক, বাস্তবায়নকারী এবং সহায়তাকারী—যারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়েদের সহায়তা করেন; তাদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বের দিকে ফিরে তাকাতে সহায়তা করা; পাশাপাশি তাদের পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশলগুলোকে আরও জোরদার করাও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে। যেহেতু পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলায় কমিউনিটির সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এই গবেষণায় সংকটের সময় কমিউনিটির ভূমিকা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের দ্রুত ও পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে কমিউনিটি পর্যায়ে আর কী কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিচার বিভাগ ও আইনি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ভাববে এবং চ্যালেঞ্জ ও ঘাটতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশল প্রণয়নে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়াও, পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা মেটাতেও এসব কেস স্টাডি

সাহায্য করবে। এসব কেস স্টাডি আরও বেশি টেকসই ও সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে নতুন করে ভাবা, সংকটের সময় পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের কাছে পৌঁছানোর এবং তাদের সাথে সংযোগের কর্মসূচি জোরদার ও আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থায় সাযুজ্য নিয়ে আসার পথপরিক্রমার একটি সূচনাবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়।

'করোনাকালে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ' শিরোনামের প্রতিবেদন ও নীতি-সারকথাসহ এই গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে। প্রতিবেদন থেকে গবেষণা ফলাফলের একটি সাধারণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে এই নামের সংশ্লিষ্ট নীতি-সারকথায় এসব কেস স্টাডি থেকে নীতি-সুপারিশ পাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রতিবেদনটি আলাদাভাবে প্রতিটি সহিংসতার শিকার নারীর কণ্ঠস্বর এবং পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকারের সন্ধানে এসব নারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে লড়াকু অভিযাত্রার জটিলতা তুলে ধরেছে।

আমরা দেখেছি করোনা অতিমারিতে পারিবারিক সহিংসতার আরও অবনতি ঘটেছে। বিপর্যয়, সংকট ও দুর্যোগের সময় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা আরও বেশি সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই এর প্রতিকার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের সময় সহিংসতার শিকার যেসব নারী ন্যায়বিচার লাভের সন্ধানে থাকেন, তাদের ওপর নজর দেওয়া আরও বেশি প্রয়োজন। সেজন্য, এখানে সেসব নারীর চ্যালেঞ্জ, দুর্দশার পাশাপাশি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পরিবারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তারা যেসব সহায়তা পেয়ে থাকেন—সেগুলোর ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ, কর্মসূচি এবং নীতি গ্রহণ করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের[২] বারোটি কেস স্টাডি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কেস স্টাডিগুলো তৈরি করা হয়েছে তাদের সাথে একান্ত, বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সাক্ষাৎকার, সহিংসতার শিকার নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং এই গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্লাস্ট, ব্র্যাক ও আরডিআরএসের মতো তিনটি আইনি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার নথিপত্রের ভিত্তিতে। কেস স্টাডি তৈরির ক্ষেত্রে বারোটি সাক্ষাৎকারের (২০২০ সালের শেষে এবং ২০২১ সালের শুরুতে দুই মেয়াদে নেওয়া হয়েছে) লিখিত সংস্করণ এবং ৯২টি তথ্যঅভিজ্ঞের সাক্ষাৎকারকে উপাত্তের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব তথ্যের সম্পূরক তথ্য পেতে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীদের মাধ্যমে কেস স্টাডিগুলো পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান তথ্যের ঘাটতি পূরণ এবং প্রতিটি কেস স্টাডি হালনাগাদ করতে প্রত্যেক উত্তরদাতার কাছে ২০২১ সালের দ্বিতীয় ভাগে আবারও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এরপর এসব কেস স্টাডি ব্লাস্টের গবেষণা দলের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ছিল, সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি ও প্রতিবন্ধকতা, নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথে বাধা এবং কমিউনিটি, এনজিও এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার ব্যাপারে আইনি বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

এই গবেষণায় পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি উভয় প্রকার সেবাপ্রদানকারীদের অভিজ্ঞতারও মিশ্রণ করা হয়েছে। সেবাপ্রদানকারীদের অনেকেই নিজেদের পেশাগত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে সাহায্য-সহায়তা দিয়েছেন। অন্যদিকে, অনেক সেবাপ্রদানকারীকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যই বিভিন্ন প্রণোদনা দিতে হয়েছে বলে জানা গেছে। এসব কেস স্টাডিতে দুই ধরনের বাস্তবতাই উঠে এসেছে।

প্রতিটি কেস বা ঘটনার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আইনি মন্তব্যের আলাদা সারণি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ আইনি পাদটীকা পাওয়া যাবে পরিশিষ্টে। বিআইজিডি/ব্লাস্ট/ব্র্যাক/আরডিআরএসের গবেষণার বারোটি কেস স্টাডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিবেচনায় এবং বাংলাদেশে মুসলিম আইনের অধীনে বিয়ে হওয়া নারীদের কথা মাথায় রেখে এই পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু বা খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইন, প্রথাগত আইন বা বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় বিয়ে হওয়া নারীদের পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এই পাদটীকায় আলোচনা করা হয়নি।

[২] পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও তাদের পরিবারের পরিচয় গোপন রাখতে পুরো গবেষণায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার মূল ফলাফল

পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীরা কোথায় এবং কার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছেন—তা এই গবেষণায় সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি সহিংসতার শিকার নারীদের কাছে কোন ধরনের সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে অভিগম্যতা সহজ বা কার্যকর মনে হয়েছে এবং কী ধরনের সুরক্ষা তারা পেয়েছেন তা–ও দেখা হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যমান আইন, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকাণ্ডের কোনগুলো সহিংসতার শিকার নারীদের প্রয়োজনে কাজে লেগেছে বা লাগেনি তা–ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া এখানে পরিবারের সদস্য (পিতামাতা, ভাইবোন এবং আত্মীয়স্বজন), প্রতিবেশী, কমিউনিটির নেতা, রাজনৈতিক দলের সদস্য, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, এনজিও, আইনি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের প্যারালিগ্যাল এবং নারী সংগঠন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিজ্ঞ আইনজীবী, আদালতের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞ বিচারকদের মতো নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা বা স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। যদিও পারিবারিক সহিংসতায় সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারাও প্রাসঙ্গিক। তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা না করার কারণ হলো সহিংসতার শিকার কোনো নারীই তাদের কথা উল্লেখ করেননি।

পারিবারিক সহিংসতার পেছনে প্রধান কারণ যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারা। বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় কিংবা সংসার চলাকালে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া আইনত নিষিদ্ধ। যৌতুকসংক্রান্ত অপরাধীকে সর্বনিম্ন এক বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার টাকা (যৌতুক হিসেবে দাবি করা টাকার অংকের চেয়ে অনেক কম) জরিমানা করার কথা আইনে বলা হয়েছে (যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ এবং ২০১৮ সালের আগে দায়ের করা মামলার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০)। তবে এই গবেষণায় যেসব নারীর কেস স্টাডি করা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে বেশিরভাগ নারী এবং তাদের পিতামাতা বা ভাইবোন বিয়ের সময় যৌতুক দিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি সংসার চলাকালে আরও যৌতুকের দাবির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। আইনে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও বর-কনে উভয় পক্ষের পরিবারই যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টিকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করেছেন। কনেপক্ষ বিয়ের সময় প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব; আর এই দ্বন্দ্ব খুব দ্রুতই সহিংসতায় রূপ নেয়। আয়েশার ক্ষেত্রে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে। যখন আয়েশার বাবা-মা তার শ্বশুরবাড়ির দাবি করা যৌতুক দিতে পারছিলেন না, তখন তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে বেঁধে গলা কেটে ফেলার চেষ্টা করেন। অন্যান্য ঘটনায় (যেমন: আফরোজা, ফাতেমা, মীনা এবং বিউটির ক্ষেত্রে) প্রতিশ্রুত যৌতুক দেওয়ার পরও ভুক্তভোগীদের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও যৌতুক দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের নানাভাবে সহিংসতার শিকার হতে হয়।

বাল্যবিবাহ বিষয়টিই এক ধরনের পারিবারিক সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতায়ও বড় ভূমিকা রাখে বাল্যবিবাহ। কিছু মধ্যস্থতাকারী এবং পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, শিশু ও অপরিণত একটি মেয়ে যখন স্ত্রী হয় এবং তাকে পারিবারিক ও যৌন দায়িত্ব পালন করতে হয়, তখন দুই পক্ষ থেকেই দ্বন্দ্ব ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। পারিবারিক সহিংসতার শিকার যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই বিয়ে হয়েছে আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে। সবগুলো ঘটনার ক্ষেত্রেই হয় বিয়ের সময় অথবা বিয়ে নিবন্ধনের সময় মেয়ের প্রকৃত বয়স গোপন করা হয়েছে নতুবা বিয়ের নিবন্ধন সনদে প্রকৃত বয়স উঠে আসেনি। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ের আয়োজন বা নিবন্ধন করা ফৌজদারি অপরাধ। এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয় (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭)। তবে, এসব বিয়ে বৈধ থেকে যায়, উভয় পক্ষেরই একে অপরের প্রতি অধিকার থাকে এবং নারী/মেয়েদের ভরণপোষণ ও আবাসনের দায়িত্ব স্বামীকে দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ খারিজ বা বাতিল ঘোষণা করা যায়—যদি স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসবাস না করে থাকেন। বহু নারী ও মেয়ের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদকে কলঙ্ক হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে তারা নেতিবাচক সামাজিক ও আর্থিক পরিণতির শিকার হয়। অর্থনৈতিক বা শারীরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাদের তখন খুব কম বিকল্প থাকে বা অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিকল্পই থাকে না। এ কারণে, এ ধরনের বিয়ে নির্যাতনমূলক হওয়ার পরও বাল্যবিবাহ টিকিয়ে রাখেন নারীরা। পাশাপাশি তাদের বাবা-মাও এসব বিয়ে টিকিয়ে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান। বিউটির ঘটনায় দেখা যায়, সমাজের লোকজন বেশ কয়েকবার তার বাল্যবিবাহ বন্ধের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার বাবা-মা গোপনে গ্রামের বাইরে গিয়ে তার বিয়ে দেন। যখন কমিউনিটির একজন প্যারালিগ্যাল তাকে উদ্ধার করতে যান, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, অর্থাৎ তার বিয়ে হয়ে গেছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের ক্ষেত্রে সম্মতি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। একটি শিশু বিয়ের ক্ষেত্রে আইনত সম্মতি প্রদানে সক্ষম হয়ে ওঠে না। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক একটি মেয়ে বিয়ের মানে কী এবং এর সঙ্গে কোন ধরনের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, তা–ও বুঝতে পারে না। ফলে সে সতর্ক সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। তবে কিছু ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনে (হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইনসহ) বাল্যবিবাহকে বৈধতা দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা-মা বা অভিভাবক মেয়ের পক্ষে সম্মতি দিতে পারেন। যেসব মেয়েশিশু অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, তারা অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল। স্বামীর সঙ্গে এই বন্ধন এবং তার ওপর নির্ভরশীলতার কারণে নারীদের জন্য এসব বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা বা বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই কঠিন। বহু নারীর ক্ষেত্রে, বয়স ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে সম্পর্কের বিস্তর ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে এসব বিয়ে বা এর ফলে সৃষ্ট সহিংসতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মা ও ভাইবোনের পদক্ষেপ গ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের ন্যায়বিচার সন্ধানের অভিযাত্রায় বাবা-মা ও ভাইবোনেরা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। পরিবারের সদস্যরা পরামর্শ, মানসিক সহায়তা কিংবা সঙ্গ দিয়েছেন

এসব নারীকে। পাশাপাশি তারা সামাজিক সালিশ বা মধ্যস্থতা, এনজিও সেবা, ক্লিনিক, হাসপাতাল, এমনকি বিজ্ঞ আদালতের সহায়তা পেতে যেসব মানুষ দরকার, তাদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের আর্থিক অবস্থা নাজুক হওয়ার পরও আশ্রয় ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। পরিবার, বিশেষ করে বাবা-মা সহিংসতার শিকার নারীদের শ্বশুরবাড়ির আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণের চেষ্টা করেছেন। তারা আশা করেছিলেন, এর ফলে বিয়েটা টিকে থাকবে এবং নির্যাতনের মাত্রা কমবে। আফরোজার ঘটনায় দেখা যায়, সহিংসতার বিপরীতে তার সুরক্ষা নিশ্চিতে তার মা সবচেয়ে উদ্যোগী ছিলেন। রিনা, আয়েশা ও কমলার ক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্যরা তাদের বৈরী ও নির্যাতনমূলক পরিবেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই নারীদের পরিবারের সদস্যরা তাদের বাবা-মার আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। নিজেদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য টাকা পাঠানোর দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয় এসব ঘটনায়। রিনাকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন বেঁধে হত্যার চেষ্টা করেন। তখন রিনার পরিবার তাকে উদ্ধার করে। ভাইবোনরাও (যারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন) সহিংসতার শিকার নারীদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ বিয়ে বা শ্বশুরবাড়ির বাইরে এসে টিকে থাকার বিকল্প পথ সৃষ্টি করে দেওয়ার মাধ্যমে এসব নারীকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছেন তাদের ভাইবোনরা।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, সহিংসতার শিকার বেশিরভাগ নারীই আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে প্রথমে তাদের পরিবার, এরপর প্রতিবেশী ও স্থানীয়দের কাছে সহায়তার সন্ধান করেছেন। বেশিরভাগ নারীর ক্ষেত্রেই পরিবারের পরই সমাজের লোকজন ছিলেন তাদের প্রথম যোগাযোগের স্থান। সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তারা আরও বিস্তৃত পরিসরে সহায়তার সন্ধান শুরু করেন। বেশিরভাগ কেস স্টাডিতে দেখা যায়, নারীরা প্রথমে প্রতিবেশী, মাতব্বর বা শিক্ষকের মতো সমাজের নেতাদের (প্রায় সবাই পুরুষ ও প্রবীণ) কাছে সহায়তা চেয়েছেন। দেখা গেছে, প্রথার বাইরে গিয়ে কিছু ভিন্ন পর্যায়ের কমিউনিটি নেতাও ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেনাবাহিনীতে থাকা আত্মীয়, সহিংসতার শিকার নারীদের এলাকার বাড়ির মালিক প্রমুখ। এখান থেকে ক্ষমতা কাঠামো ও সম্পর্কের মধ্যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, ধর্মীয় নেতারা এসব ঘটনায় কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করেননি। বেশ কয়েকজন সহিংসতার শিকার নারী যৌন নির্যাতন এবং সংসার জীবনে সহিংসতার কথা বলতে বা অভিযোগ জানাতে লজ্জা পেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আদালতে প্রতিকার খুঁজতে গেলে সামাজিকভাবে নেতিবাচক পরিণতি ও আর্থিক খরচের সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে নারীরা তাদের সর্বোত্তম আশ্রয় হিসেবে সমাজে বিদ্যমান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সমাজের এসব প্রভাবশালী ব্যক্তি সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা, সামাজিক সালিশ বা বৈঠকের বন্দোবস্ত বা পরিচালনা করা বা আলোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। তারা শুধু দ্বন্দ্ব নিরসনেই অংশ নেননি, পাশাপাশি যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে তাদের কাছে এই নারীদের পাঠিয়েছেন।

প্যারালিগ্যাল এবং কমিউনিটি অ্যানিমেটর তথা রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়কগণ স্থানীয়ভাবে দ্বন্দ্ব নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকক্ষেত্রে তারা অপরাধীদের কাছ থেকে এসব নারীকে বাঁচিয়েছেন। প্যারালিগ্যালরা হলেন এনজিও কর্মী। তারা সমাজে ও আদালতে যেসব দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষ ন্যায়বিচার চায়, তাদের সহায়তা করেন। কমিউনিটি অ্যানিমেটররা হলেন স্বেচ্ছাসেবী, যারা রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক বা মিডিয়েটর হিসেবে বিবাদ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করেন। এর পাশাপাশি তারা সহিংসতার শিকার নারীদের ন্যায়বিচার সন্ধানের পথও দেখিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আইনজীবীদের মতো সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের খোঁজ দেওয়া বা সেখানে সহিংসতার শিকার নারীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। বেশকিছু ঘটনায় তারা সহিংসতার শিকার নারীদের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া, সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং নির্যাতনকারী স্বামীদের জবাবদিহি করানোর মাধ্যমে এসব নারীকে ন্যায়বিচার চাইতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিউটি ও ফাতেমার ক্ষেত্রে প্যারালিগ্যাল ও রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়কগণ তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করেছেন।

এই গবেষণায় যেসব নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই একাধিকবার নিজেদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সহিংসতা বন্ধ এবং বিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। সহিংসতার শিকার নারীরা বহু জায়গায় বহুবার চেষ্টা-তদবির করে দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা বন্ধ করে বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন, বিশেষ করে যাদের সন্তান ছিল। ওইসব নারীর পরিবারের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার ছিল বিয়ে টিকিয়ে রাখা। আমাদের সমাজে বিয়ে ভেঙে যাওয়াকে ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখা হয়। আর এই পরিণতিকে যে কোনো মূল্যে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিয়েকে ঘিরে সামাজিক রীতিনীতির শক্তি তো রয়েছেই, এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্পের অভাব। এর ফলে বেশিরভাগ নারী পুনঃপুন সহিংসতা সহ্য করে নিজেদের নির্যাতনকারী স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের বারবার সুযোগ দিয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। সাদিয়া ও রেশমার মতো কিছু নারী বিশ্বাস করতেন, ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা এনজিওর মাধ্যমে সালিশের হুমকি বা সত্যি সত্যি সালিশ ডেকে কিংবা আদালতে মামলা করে তারা নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক করে ফেলতে পারবেন। এর ফলে নিজেদের ও সন্তানদের প্রতি তাদের স্বামীদের সহিংসতা ও আগ্রাসন বন্ধ করতে পারবেন। মজার ব্যাপার হলো, দুই ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টারত অবস্থায় এই নারীদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের সম্পর্ক চলমান ছিল। এই নারীদের স্বামীরা তাদের বাপের বাড়ি গিয়ে একসঙ্গে রাত কাটিয়েছেন এবং অনেক সময় এসব নারীও তাদের শ্বশুরবাড়ি ফিরে এসেছেন। সাদিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি ঢাকায় এসে স্বামীর সঙ্গে আবার সম্পর্ক শুরু করেন। তাছাড়া স্বামীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও তুলে নেন সাদিয়া। কমলার মতো অন্যান্য নারী—যারা বুঝতে পেরেছেন যে পুনরায় সম্পর্ক জোড়া লাগানো অসম্ভব, তারা আদালতে মামলার পেছনে লেগে থেকে স্বামীদের সাজা নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি তারা যৌতুক হিসেবে দেওয়া অর্থও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করেছেন। আদালতের শরণাপন্ন হওয়া কিছু নারী তাদের শ্বশুরবাড়ির লোকদের ভয় দেখানো বা চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে

বিষয়টিকে দেখেছেন, যাতে করে তারা শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসতে পারেন। যেমন রেশমা ও তার পরিবার মনে করতো, আদালত তাকে স্বামীর বাড়ি ফিরে যেতে এবং নির্যাতন বন্ধে সাহায্য করবেন।

পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার সন্ধানের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে আয়, ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তার সীমিত বিকল্প থাকা। শিক্ষার অভাব, আয়রোজগারের অভাব, পৈতৃক পরিবার অবস্থাপন্ন না হওয়া, বিয়েকে ঘিরে থাকা সামাজিক রীতিনীতি এবং বিবাহিত নারী হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বেশিরভাগ নারীকে সহিংসতার শিকার হতে বাধ্য করেছে। কেননা, এই বিষয়গুলো সংসার জীবনে সহিংসতার প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করার ব্যাপারে নারীদের সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। বহু নারী আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার সন্ধানের চেষ্টা এড়িয়ে গেছেন। তারা ভয় পেয়েছেন যে, এর ফলে তাদের বিয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। তাই তারা সামাজিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। নারীরা বারবার বলেছেন তাদের মূল দাবি হলো—'আমি স্বামীর ভাত খাবো' অর্থাৎ তারা বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চান। তারা একসঙ্গে খেয়ে-পরে থাকতে চান (সম্ভবত আরও স্পষ্টভাবে এর মানে হলো বিয়েটাই তাদের অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন)। বিয়ের পর তারা যে ঘর তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, তাকে তারা নিজেদের 'সংসার' হিসেবে দেখেন। এই সংসারে তারা বিভিন্ন সম্পদ জমা করেছেন। তারা বলেছেন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িই হলো তাদের বাড়ি। সাক্ষাৎকার দেওয়া নারীদের মধ্যে যাদের সন্তান ছিল, তাদের কোনো জীবিকার উৎস ছিল না গৃহব্যবস্থাপনার কাজ ছাড়া। যদিও কোনো শহর বা অন্যত্র গিয়ে এবং কোনো কারখানায় কাজ করে বাংলাদেশে জীবিকা উপার্জনের পথ এখন বহু নারীর জন্য খোলা রয়েছে। তবে এখনও তা সমাজে খুব একটা অনুমোদিত নয়। বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনো বিবাহিত নারী কাজ করছেন, এই বিষয়টিকে এখনও একধরনের মর্যাদাহানি হিসেবে দেখা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান মন্তব্য করেছেন,

> "যদি কোনো নারী তার স্বামীকে হারান, তাহলে তিনি সম্মান হারান। তিনি নির্লজ্জ। যদি তার বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তিনি চাইলে যা ইচ্ছা করতে পারেন। এমনকি চাইলে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করতে পারেন। অন্য পেশায়ও কাজ করতে পারেন। যদি তার প্রথম বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার মনুষ্যত্ব ও সম্মান অর্ধেক হয়ে যায়।
>
> —ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব উদ্বেগের বড় কারণ। দিলরুবার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, একজন নারী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে নিজের দেনমোহরের টাকা পুনরুদ্ধার করতে পারলেও তার পরিবার মেয়ের অবিবাহিত থাকাকে নিরাপদ বা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তারা মনে করেন, অবিবাহিত একজন নারী যে কোনো সময় যে

কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন অথবা কারো দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। সেজন্য দিলরুবার পরিবার তাকে আবারও একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে বিয়ে দেন।

ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সহায়তাকারীদের কাছে গেলে তারা অনেক সময় নারীদের স্বার্থ ও অধিকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন। বেশিরভাগ কেস স্টাডিতে সহিংসতার শিকার নারীরা এবং তাদের পরিবার ন্যায়বিচার সন্ধানের কোনো এক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্যদের কাছে গেছেন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত এসব জনপ্রতিনিধির মনে হয়েছে তাদের নারী ভোটাররা তাদের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য আসতেই পারেন। তারা ভোটারদের সমস্যা সমাধানকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে মনে করেছেন। সালিশকালে তারা ভুক্তভোগী পরিবার এবং সালিশের ফলাফলকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেছেন। রিনার ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যেমন বলেছেন, "আমি এই পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে সালিশ করেছি।"

তবে সহিংসতার শিকার অনেক নারী স্পষ্ট করে বলেছেন, এসব জনপ্রতিনিধির মূল চেষ্টা ছিল দম্পতিদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বিয়ে টিকিয়ে রাখা। সহিংসতা বন্ধের চেয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখাকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিরাও এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন। এমনকি সমাজের সবাই যেসব সহিংসতার কথা জানেন, সেসব ঘটনায়ও জনপ্রতিনিধিরা নির্যাতনের শিকার নারীদের বিয়ে টিকিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। বিউটি স্পষ্টভাবেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন, যা নিশ্চিতভাবে একটি অপরাধ। তার ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। মেয়েটির নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কিংবা অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা না করে, মেয়েটিকে তার স্বামীর বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা করেন সেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। রুমার বয়স ছিল চৌদ্দ। অন্যদিকে তার স্বামীর বয়স ছিল বিশ। বয়সের ব্যবধানের কারণে সহিংসতা ঘটেছে জানার পরও চেয়ারম্যান যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা অনেক সময় নারীদের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষা করে থাকেন। বিপরীতে তারা স্বামীর দ্বারা সহিংসতাকে সামাজিক রীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বেশকিছু কেস স্টাডিতে দেখা যায়, ইউপি চেয়ারম্যানরা ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করেছেন এবং পুনরায় সহিংসতার মুখে ফেরত পাঠাতে ভূমিকা রেখেছেন। সহিংসতার শিকার নারীদের নির্যাতনকারী শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন তারা। অথচ অপরাধীরা অন্যায়ের কথা স্বীকার পর্যন্ত করেননি। যেমন আফরোজাকে প্রচণ্ড মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। বিউটিকে বলা হয় মাফ চেয়ে আবারও নির্যাতনকারী শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে। বিউটি বিয়ে ভেঙে দিতে সাহায্য চেয়েছিলেন, বিয়ে টিকিয়ে রাখতে নয়। স্থানীয় সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি আবার নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক গৎবাঁধা আচরণের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে দেখেছেন। এসব জনপ্রতিনিধি সহিংসতার কারণ হিসেবে শাশুড়ি ও ছেলের বউয়ের মধ্যে ঝগড়াকে চিহ্নিত করেছেন। তারা শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার কথা বর্ণনা করলেও স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের কথা বিস্তারিতভাবে বলেননি।

প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে ন্যায়বিচারের সন্ধানে নারীরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হন। বেশ কয়েকজন সহিংসতার শিকার নারী (যেমন– বিউটি, রেশমা, ফাতেমা এবং আয়েশা) এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। মামলা দায়ের ও পরিচালনার জন্য নেওয়া পদক্ষেপ তারা বুঝতে পারেননি। সেজন্য মামলা পরিচালনার জন্য তারা সম্পূর্ণ উকিলের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। বেশিরভাগই উকিলের পরামর্শ অনুসরণ করেছেন। ঠিকমতো তারা এসব বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে পারেননি কিংবা অন্যান্য উপায় সন্ধানের চেষ্টা করেননি। তবে দুটি ঘটনায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। সহিংসতার শিকার এই দুই নারীর মায়েরা ভূমিসংক্রান্ত দ্বন্দ্বে মামলা-মোকদ্দমায় আদালত ও আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই তারা নিজেদের মেয়েদের আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে পেরেছিলেন।

নারীরা এ ধরনের নির্যাতনমূলক বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চাওয়ার একটি কারণ হলো, তারা পিতৃপরিচয় বা আর্থিক ও সামাজিক সমর্থন ছাড়া সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পান। বারো জন নারীর মধ্যে নয় জনেরই সন্তান ছিল। এদের প্রত্যেকের জন্যই এই বিষয়টি ছিল উদ্বেগের। এসব নারী বলেছেন, তারা মূলত সন্তানের কথা ভেবেই সংসার টিকিয়ে রাখতে নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা মনে করেছেন, পিতাবিহীন সন্তানকে সমাজে 'অভিভাবকহীন' হিসেবে দেখা হবে, যা মূলত এতিম হিসেবে দেখারই নামান্তর। সমাজে সন্তানের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার জন্য পিতার পরিচয়কে অপরিহার্য হিসেবে ভাবা হয়। যদিও মহামান্য উচ্চ আদালত সন্তানের লালনপালনের বিষয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সন্তানের কল্যাণের বিষয়টি দেখে থাকেন, কিন্তু অভিভাবকত্ব নির্ধারণের সময় এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয় না। অথচ ১৯৮০ সালের অভিভাবকত্ব আইনের ১৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কিছু বিষয় সন্তানের কল্যাণের জন্য বিবেচনা করতে হবে।[৩] এই বিষয়টি স্থানীয় আদালতের সিদ্ধান্ত বা সামাজিক সালিশ বা মধ্যস্থতায় প্রতিফলিত হয় না। কেস স্টাডিতে যে নারীদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারা বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতির কথা বলেছেন। তাদের মতে, সন্তানরা যেন বাবাকে অভিভাবক হিসেবে পায়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মূলত নারীদেরই। তারা এ-ও মনে করেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একজন নারী নিজে সন্তানদের অভিভাবক হতে সক্ষম নন।

নারীদের ন্যায়বিচার সন্ধানের পথে দুর্নীতি অন্যতম একটি বাধা। কেস স্টাডির বারো জন নারীর মধ্যে সাত জনেরই কোনো আয়রোজগার ছিল না। ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে খরচ বহন করার জন্য তারা তাদের বাবা-মা কিংবা ভাইবোনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনেক ঘটনায় দেখা যায়, এসব নারী বা তাদের পরিবার সেবা পেতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সালিশকার,

[৩] ঢাকার দ্বাদশ সহকারী জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক ২০১৮ সালে প্রদত্ত এক ব্যতিক্রমধর্মী রায়ে বাংলাদেশের মডেল ও অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন তার কন্যার সাধারণ হেফাজতের পরিবর্তে পূর্ণ অভিভাবকত্ব লাভ করেন। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ রায় রয়েছে, যাতে ব্যক্তিগত আইনের সীমাবদ্ধতার উত্তরণ ঘটেছে এবং শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ ও সন্তান প্রতিপালনে নারীর অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। [https://archive.dhakatribune.com/showtime/2018/04/30/badhon-receives-guardianship-daughter-saira]

নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের অর্থ প্রদান করেছেন। আফরোজার মা তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। এজন্য তাদেরকে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। রেশমা ও তার পরিবার মনে করে, অর্থ দিতে না পারায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের মামলা নেয়নি। রুপা বলেন, মামলা দায়ের করার পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার স্বামীর পরিবার আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে টাকা দিয়েছিল। এ কারণে হতাশ হয়ে তিনি আর মামলা লড়তে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মামলা চালাতে গেলে আর্থিক বোঝা বহন করতে হবে।

এই কেস স্টাডিগুলো থেকে সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা, বিয়ের শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং প্রতিকার সন্ধানে নারীদের যে মূল্য দিতে হয় এবং পরিণতি ভোগ করতে হয়, তার চিত্র পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের কাছে বিচার চাইতে যাওয়া (যাতায়াত খরচ ও অনানুষ্ঠানিক ফি), সালিশে লোকজন জড়ো করা, পরিবারের কোনো সদস্য বা সন্তান নিয়ে জেলা আদালতে যাওয়া (সাদিয়ার ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যায়) ইত্যাদি কাজে নারীদের টাকা খরচ হয়। নারীদের কেউ কেউ আবার সামাজিক বিপত্তির কথাও বলেছেন, যেমন নারীদের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া। তারা ভয় পান যে সমাজে তাদের 'মামলাবাজ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এর ফলে নতুন করে বিয়ের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেসব নারী ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকদের রোষানলে পড়ে তারা আরও বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের হুমকি বা সত্যি সত্যিই তারা বিবাহবিচ্ছেদের শিকার হয়েছেন।

এসব কেস স্টাডিতে একপাক্ষিক বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনায় নারীদের বিপন্নতা উঠে এসেছে। বাংলাদেশে বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম আইন[৪] প্রয়োগ হয়। এই আইনের আওতায় নারীদের স্বেচ্ছা প্রক্রিয়ায় একপাক্ষিকভাবে তালাক দিয়ে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে নারীরা সীমিত আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। স্বামী যদি তালাকের প্রক্রিয়া শুরু করেন, তাহলে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন না। একমাত্র সম্ভাবনা হলো তাকে সিদ্ধান্ত বাতিলে রাজি করাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতির চেষ্টা করা। যেখানে বেশিরভাগ নারীর নিজস্ব কোনো আয় বা জীবিকার সুযোগ নেই এবং বিয়ের পর তাদের ভরণপোষণের অধিকার অন্যের অধীন (মুসলিম আইন অনুযায়ী) থাকে, সেখানে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর নারীরা দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বিপন্নতার মধ্যে থাকেন। এসব কারণে নারীরা হয়তো তালাক আটকানোর চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী তাদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। একজন স্বামী চাইলে তার স্ত্রী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শুধু একটি নোটিশ পাঠিয়েই তালাকের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। প্রথম নোটিশ পাওয়ার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চাইলে (কিন্তু বাস্তবে খুব কমই হয়) নব্বই দিনের মধ্যে উভয়পক্ষকে একত্র করে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিরসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী এরপর আর কোনো নোটিশ না পেলেও নব্বই দিন পর তালাক আপনাআপনি কার্যকর হয়ে যাবে

[৪] প্রতিবেদনটিতে শুধু মুসলিম পারিবারিক আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কেস স্টাডিতে উল্লিখিত নারীদের সবাই মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীন বিবাহিত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত তাদের অধিকার নির্ধারণে এ আইন প্রযোজ্য।

[ধারা ৬, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন]। অন্য পদ্ধতি হলো, অনেক সময় নারীরা 'খুলা তালাক'ও পেতে পারেন (আয়েশা ও দিলরুবার ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে)। এসব ক্ষেত্রে, একজন নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। নারীর সক্রিয় সিদ্ধান্ত ছাড়া, তালাকের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া যাবে না। 'খুলা' তালাকের ক্ষেত্রে তালাকের নোটিশে স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্মতি এবং স্বাক্ষরই লাগবে। এরপর তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হবে [ধারা ৭, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন]। যদি পারিবারিক সহিংসতার কোনো মামলা চলমান থাকা অবস্থায় স্বামী তালাকের নোটিশ দেন, তাহলে তালাক হয়ে যাওয়ার পর এই আইনের অধীনে স্ত্রীর নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। একজন নারী শুধু তার স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা আইনের অধীনে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। পারিবারিক আদালতে মামলার বিপরীতে পারিবারিক সহিংসতা আইনের সীমিত ব্যবহার হয়।

দেনমোহরের টাকা পুনরুদ্ধার করা হলেও, তা নারীর কোনো ধরনের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করে না। বারোটি ঘটনার মধ্যে চারটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারীরা তাদের দেনমোহরের টাকা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। বিয়ের চুক্তিতে যে পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ ছিল, তা সম্পূর্ণ বা আংশিক উদ্ধার করতে পেরেছেন। দেনমোহরের টাকা সাধারণত একটা থোক অর্থ হিসেবে দেওয়া হয়। আবার যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে, তালাকের সময় প্রায়ই তার চেয়ে কম দেওয়া হয় (সমঝোতার মাধ্যমে)। কিন্তু এই অর্থ নারী কিংবা তার সন্তানের জন্য দীর্ঘমেয়াদে অপর্যাপ্ত। সাধারণত এই অর্থ বিয়ের সময় স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ধার্য করা হয়। কিন্তু তালাকের সময় সমঝোতামূলক আলোচনায় প্রকৃত অর্থ থেকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ কমে যায়।

মুসলিম আইনের অধীনে বিয়ে হওয়া একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী শুধু নিজের জন্য তিন মাসের কিংবা গর্ভধারণের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের দাবি করতে পারেন। অর্থাৎ যেটি বেশি দীর্ঘায়িত সেটি প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে, বিবদমান দুই পক্ষ যদি বিয়ের বন্ধনে থাকে তাহলে স্বামী তার তালাক বা মৃত্যু পর্যন্ত ভরণপোষণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ অন্য কোনো জীবিকার উপায় বা পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় একজন নারী তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণ তার বাবা-মা বা ভাইবোনের ওপর নির্ভরশীল থাকেন। কেস স্টাডিগুলো থেকে দেখা যায়, নারীদের পৈতৃক পরিবার তাদেরকে সহায়তা করতে ইচ্ছুক হলেও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান নয়। করোনা অতিমারিকালে এই সামর্থ্য আরও কমেছে।

কিছু নারীর ক্ষেত্রে তাদের স্বামী সন্তানের ভরণপোষণের খরচ দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু নিয়মিত তা আদায় নিশ্চিত করা কঠিন ছিল (সাদিয়া ও মিতার ঘটনায় যেমনটি দেখা গেছে)। এখান থেকেই বোঝা যায়, কেন নারীরা সমঝোতার মাধ্যমে এককালীন টাকা পেয়ে এমন কোথাও বিনিয়োগ করতে চান—যেখান থেকে নিয়মিত তাদের আয় আসবে।

বেশকিছু ঘটনায় দেখা গেছে, নারীরা তাদের শ্বশুরবাড়ির ওপর অধিকার হারানোর পর তাদের গৃহস্থালির যাবতীয় অধিকার হারান। এসব ঘটনায় তাদের বৈষয়িক ক্ষতির পাশাপাশি আবেগীয় ক্ষতিও যুক্ত রয়েছে। এসব সম্পদ তারা বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। তারা হয়তো সংসার খরচ বাঁচিয়ে এসব জিনিসপত্র তৈরি করেছেন অথবা বাসাবাড়ি-কারখানায় কাজ করে টাকা জমিয়ে সেগুলো কিনেছেন। মিতার অলংকার এবং সংসারের অন্যান্য জিনিসপত্র তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী ও শাশুড়ি নিয়ে নেন। সাদিয়ার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তার শাশুড়িও সাদিয়ার গড়ে তোলা বা কেনা জিনিসপত্র নিয়ে নেন। শুধু আয়েশা তার জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এর কারণ সম্ভবত হাঁড়িপাতিলের খুব বেশি একটা মূল্য নেই।

একজন ভুক্তভোগীর যৌথ পরিবারে থাকা [ধারা ১, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন] কিংবা আদালতের আদেশ থেকে আবাসন নিশ্চিত করা বা ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সময় এসব অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সহিংসতার শিকার নারী, তাদের পরিবার বা সমাজের অন্যান্যের খুব বেশি বা কোনো সচেতনতাই নেই। ব্যতিক্রম হলো আফরোজার ঘটনা। এক্ষেত্রে আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয় যে—তালাকের পরও আফরোজা তার শ্বশুরবাড়ির পরিবারে বসবাস করার অধিকার রাখেন। তবে আফরোজার পরিবার এই অধিকার আদায় করতে চায়নি। কারণ তারা ভয় পান যে তার সহিংস স্বামী যে বাড়িতে থাকবেন, সেই একই বাড়িতে থাকলে তার শারীরিক নিরাপত্তা থাকবে না।

অনেক কেস স্টাডিতে দেখা যায়, নির্যাতনমূলক বিয়েতে বিবাহিত নারী এবং তাদের সন্তানরা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত ও দুর্ভোগ পোহান। সাদিয়া, রেশমা, কমলা ও রূপা—প্রত্যেকেই তাদের ভালো না থাকার কথা বলেছেন। তারা জানান, মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছে। তারা ঘুমাতে, খেতে পারেননি অর্থাৎ 'স্বাভাবিক জীবনযাপন' করতে পারেননি। এসব নারীর দুর্ভোগ দেখে তাদের বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা যে কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তা-ও স্পষ্ট। যেসব সন্তান এমন ক্রমাগত সহিংসতা দেখেছে বা এর মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে, তাদের ওপরও এর প্রভাব পড়েছে। রেশমা শুধু তার স্বামীর ক্রমাগত সহিংসতাই নয় বরং তার বারো বছর বয়সী সন্তানের কাছ থেকেও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তার ছেলেকে তার স্বামী প্রভাবিত করেছেন। ফলে তার ছেলেও তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, তার দাদাকে অপমান করা এবং চাচাকে হুমকি দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেছে। পারিবারিক সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক পরিণতির জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়। এসব ক্ষেত্রে বিবাহিত নারী-মেয়ে, তাদের সন্তান-পরিবার এবং অপরাধীর জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে।

কেস স্টাডির বেশিরভাগ নারীই ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টার কোনো এক পর্যায়ে পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত সংকট সমাধানের উপায় হিসেবে মধ্যস্থতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু অল্প কিছু নারীই শুধু মধ্যস্থতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পেরেছেন। দেখা গেছে এনজিও, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার সেবা থাকা সত্ত্বেও তারা সমস্যার সমাধান, পরামর্শ ও

তথ্য চাওয়া কিংবা সমর্থন আদায়ের জন্য সমাজের দ্বারস্থ হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। নারীদের আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না চাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে– এসব সেবা পাওয়ার খরচ, আইনি সহায়তা পেতে বাধা, প্রক্রিয়াগত জটিলতা, মামলা ঝুলে থাকা এবং আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তথ্য ও জানাশোনার ঘাটতি। সেজন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতা পাওয়ার প্রতিই সাধারণত ঝোঁক থাকে (সিদ্দিকী, ২০০৩)। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সমাজের কাছ থেকে সামাজিক ও নৈতিক সমর্থন এবং আইনি সেবা সংগঠন ও তাদের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা পেলে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিচার পাওয়া সহজ হয় (ইসলাম ও আলম, ২০১৮)।

এ-ও দেখা গেছে, বেশকিছু ঘটনায় সামাজিক পর্যায়ে মধ্যস্থতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে। অর্থাৎ স্বামী ও তার পরিবারকে সমস্যার সমাধান এবং বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য চাপ দিতে আইনি পদক্ষেপের হুমকি দেওয়া হয়েছে সামাজিক পর্যায় থেকে। কিছু ঘটনায় এই পদ্ধতি কাজ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্টো ফল হয়েছে। ওইসব ঘটনায় স্বামী ও তার পরিবারের অবস্থান আরও কঠোর হয়ে তালাক নিশ্চিত করেছে।

উপসংহারে বলা যায়, এসব কেস স্টাডি বারোজন নারীর ন্যায়বিচারের অভিযাত্রাকে আলোকপাত করেছে। সহিংসতা বন্ধে তাদের নিরন্তর চেষ্টা এবং বিয়ে টিকিয়ে রেখে নিজের ও সন্তানের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের সাহস ও সংগ্রামের গল্প উঠে এসেছে এসব কেস স্টাডিতে। বিয়ে ভেঙে যাওয়া যখন নিশ্চিত হয়েছে, তখন নারীরা নিজেদের দেনমোহর বা ভরণপোষণের খরচ চেয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। এই দাবি আদায় করতে গিয়ে নিজেদের সাধ্যের মধ্যে যা যা পদ্ধতি ছিল, সবই তারা ব্যবহার করেছেন। তবে এসব নারীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় তালাকের পর শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক যে সহিংসতার মুখোমুখি তারা হয়েছেন এবং যে ধরনের অর্থনৈতিক বিপন্নতার মুখে তারা পড়েছেন, সেজন্য অপরাধীদের আর দায়ী করে রাখা যায়নি।

এসব কেস স্টাডি থেকে যেসব প্রতিবন্ধকতা উঠে এসেছে, তা মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি-সংস্কারের বিষয়ে 'অতিমারিকালে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ' শিরোনামে নীতি-সারকথা এবং একই নামের প্রতিবেদনে আরও বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।

আরডিআরএসের কমিউনিটি অ্যানিমেটরের সঙ্গে আয়েশার মায়ের বৈঠক।

দ্বিতীয় ভাগঃ কেসসমূহ

সারা রাত তালাবদ্ধ আফরোজা

আফরোজা তার মুঠোফোন ব্যবহার করছেন। যখন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তখন আফরোজা তার মা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেন। এছাড়াও আমাদের গবেষণায় পারিবারিক সহিংসতার শিকার আফরোজা হলেন একমাত্র নারী, যিনি সাহায্য পেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেছেন। ফেসবুকে পরিচয় হওয়া একজন সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন।

ক. সারা রাত তালাবদ্ধ: আফরোজা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

যৌতুক, প্রবাসী শ্রমিক, জোরপূর্বক বিয়ে, শাশুড়ি কর্তৃক আবেগীয় প্রতারণা, একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখা, ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস (এইচআরএলএস), আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বসবাসের অধিকার

ভূমিকা

আফরোজার বয়স ২৪ বছর। ২০১৪ সালে তার বিয়ে হয় সাইফুলের সঙ্গে। সাইফুল মালয়েশিয়ায় একজন প্রবাসী নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ২০২০ সালে সাইফুল আফরোজাকে তালাক দেওয়ার আগপর্যন্ত ছয় বছর সংসার করেছেন। তাদের কোনো সন্তান নেই। ছয় বছরের সংসারজীবনে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও স্বামীর কাছ থেকে যৌতুকের দাবিতে আফরোজা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। আফরোজা এবং তার মা বৈবাহিক দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের কাছে যান। এই গবেষণার কেসগুলোর মধ্যে আফরোজাই পারিবারিক সহিংসতার শিকার একমাত্র নারী, যিনি সহায়তা পেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (ফেসবুক) ব্যবহার করেছিলেন। তবে তার একাধিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আফরোজার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করেন। যেহেতু সাইফুল আবার বিয়ে করেছেন, তাই আফরোজা আর তার কাছে ফিরে যেতে চান না। এখন তিনি সাইফুলকে শাস্তি দিতে আইনি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বৃত্তান্ত

আফরোজা তার বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে তাদের বাড়ি। তার বাবার একটি গরুর খামার ছিল। সেখান থেকে তার বাবা দুধ বিক্রি করে আয়রোজগার করতেন। তাদের একটি ছোট দোকানও ছিল। তার বাবা-মা দুজন মিলে সেই দোকান চালাতেন। অর্থনৈতিকভাবে তারা ছিলেন সচ্ছল। তবে আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটার পর এখন তার বাবা চাষাবাদ করেন আর মা গৃহিণী।

সাইফুলের পরিবার চাষাবাদ ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তার ভাই সিএনজিচালক। দুই বোনের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়ে গেছে; শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন। অন্য বোন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে এখন একই বাড়িতে সাইফুলদের সঙ্গে থাকেন। বিয়ের সময় সাইফুল মালয়েশিয়ায় ছিলেন। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। আফরোজা বিয়ের সময় এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। কিন্তু বিয়ের কারণে পরীক্ষা দিতে পারেননি।

কেস

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সাইফুলের সঙ্গে আফরোজার বিয়ে হয়। আফরোজার পরিবারই বিয়ের আয়োজন করেছিল। এ কাজে ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যের স্বামী অন্তু মিয়া সহায়তা করেছিলেন। তখন আফরোজার বয়স ছিল ষোলো বছর। সমাজে অন্তু মিয়া প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আফরোজার মায়ের ধর্মভাই। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে সাইফুল এবং তার পরিবারকে অন্তু মিয়া ভালো করেই চিনতেন। আফরোজা ও তার বাবা-মা সাইফুলের ছবি দেখে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সাইফুলের বাবা-মা বিয়ের জন্য জোরাজুরি করেন। কিন্তু আফরোজা প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তখনও তিনি সাইফুলকে সামনাসামনি দেখেননি। কিন্তু আফরোজার বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজন তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এরপর আফরোজা বিয়েতে রাজি হন বাবা-মার কথা ভেবে। সাইফুল মালয়েশিয়ায় থাকায় বিয়ে হয় টেলিফোনের মাধ্যমে। বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় আফরোজা প্রথমবারের মতো অনলাইনে সাইফুলের চেহারা দেখেন। এরপর তারা নিয়মিত ফোনে কথা বলতেন। ধীরে ধীরে সাইফুলকে পছন্দ করতে শুরু করেন আফরোজা।

বিয়ের এক বছর পর সাইফুল মালয়েশিয়া থেকে তিন মাসের জন্য দেশে আসেন। তখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আফরোজাকে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। প্রথম দুই মাস তাদের ভালোই কেটেছিল। কিন্তু যখন আফরোজার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকেন, তখন থেকে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল হতে থাকে। অনেক দেনা থাকায় আফরোজার শ্বশুর আর্থিক সংকটে ছিলেন। আফরোজা ও তার পরিবারের জন্য যৌতুকের দাবি বিস্ময়কর ছিল, কারণ বিয়ের সময় এ বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। আফরোজা মনে করেন, তার বৈবাহিক যাবতীয় সমস্যার জন্য সাইফুল নয় বরং দায়ী হলেন সাইফুলের মা। এদিকে যৌতুক নিয়ে সমস্যা চলতেই থাকে। একপর্যায়ে আফরোজার সঙ্গে তার শাশুড়ির যৌতুক নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। আফরোজা যৌতুক দিতে রাজি না হয়ে বরং প্রতিবাদ জানান। এ নিয়ে তর্কাতর্কি বেড়ে গেলে সাইফুল আফরোজাকে মারধর করেন।

এরপর যৌতুকের দাবির মুখে আফরোজা তার শ্বশুরবাড়ির ঋণ পরিশোধ করতে নিজের গয়না বিক্রি করে দেন। কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতি তখন স্বাভাবিক হয়ে আসে। এদিকে সাইফুল মালয়েশিয়ায় ফিরে যান। কিন্তু আফরোজার সঙ্গে তার শাশুড়ির ঝগড়া চলতেই থাকে। কারণ তার শাশুড়ি আরও যৌতুক দাবি করেন। সাইফুলের মা সাইফুলকে ফোন করে ঝগড়ার ব্যাপারে আফরোজার বিরুদ্ধে নালিশ দিতেন। ফলে সাইফুলও আফরোজার ওপর রাগ করতেন। এসব নিয়ে প্রায়ই ফোনে তাদের ঝগড়া হতো। সাইফুল মাসের পর মাস আফরোজার সঙ্গে কথা

বলতেন না। আফরোজা কথা বলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতেন। প্রতিবার এমন ঝগড়া হলে দুই-তিন মাস লাগত সাইফুলের রাগ ভাঙাতে।

এমনই একদিন ঝগড়ার সময় আফরোজার শাশুড়ি তাকে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ তার শাশুড়ি এমন সহিংস হয়ে ওঠায় আফরোজা হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি তখন নিজের বাবা-মার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাবা-মায়ের কাছে থাকাকালে আফরোজা বারবার চেষ্টা করেছেন সাইফুলকে ফোনে শ্বাসরোধের কথা জানাতে। কিন্তু সাইফুল ফোন ধরেননি। আড়াই মাস পর সাইফুল ফোনে আফরোজাকে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন। আফরোজা তখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান।

কিন্তু আফরোজার শ্বশুরবাড়ির যৌতুকের দাবি বন্ধ হয়নি। তার শাশুড়ি নতুন করে বাড়ি বানানোর জন্য টাকা চাওয়া শুরু করেন। তখন আফরোজার মা সিমেন্ট কেনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন। আফরোজার মা যে কোনো মূল্যে মেয়েকে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। আফরোজা এবং তার মা দুজনই আফরোজার সংসারজীবনে শান্তি বজায় রাখতে এসব করেছেন। আবারও কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

২০১৮ সালে সাইফুল বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিদেশে আয় করা সব টাকা সাইফুল তার বাবার কাছে পাঠিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সাইফুলের বাবা-মা আবারও আফরোজার কাছে তিন লাখ টাকা দাবি করেন। আফরোজা তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। সে সময় সাইফুল বেকার ছিলেন। সাইফুলের বাবা-মার কথা হলো, কিছু উপার্জন করতে না করলে তারা সাইফুল ও আফরোজাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন না। আফরোজার শাশুড়ি হুমকি দেন—যদি তারা বাড়ি না ছাড়েন, তাহলে তিনি ফাঁস দিয়ে অথবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। উপায়ান্তর না দেখে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুখে আফরোজা ও সাইফুল বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

তখন আফরোজার মা তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। তার পরামর্শে দুজন ভালুকায় গিয়ে একটি আলাদা ভাড়া বাসায় থাকা শুরু করেন। আফরোজার মা তাদের তিন মাসের খাওয়া খরচ এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দেন। এছাড়াও আফরোজার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কাপড় কিনে দেন, যাতে কাপড় সেলাই করে বিক্রির মাধ্যমে আফরোজা কিছু আয় করতে পারেন। পাশাপাশি সাইফুল একজন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ শুরু করেন। আফরোজাও একটি কারখানায় কাজ নেন। এর কিছুদিন পরেই আফরোজা অসুস্থ হয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। তবে সাইফুল আরও দশ মাস কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

ভালুকায় থাকাকালে সাইফুল মাঝে মাঝে গ্রামে তার বাবা-মাকে দেখতে যেতেন। আফরোজার মতে, এর ফলে তার প্রতি সাইফুলের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তাদের মধ্যে প্রায়ই তর্কাতর্কি হতো। সাইফুল প্রতিদিনই আফরোজাকে মারধর করতেন। আফরোজার ধারণা, তার শাশুড়িই সাইফুলের আচরণ পাল্টাতে ভূমিকা রেখেছেন। প্রায় দশ মাস পর, আফরোজার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়লে সাইফুল তাকে দেখতে যান। কিন্তু গ্রামে যাওয়ার পর সাইফুল আফরোজার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তিনি আর ভালুকায় ফিরে আসেননি। আফরোজা ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে আফরোজা শ্বশুরবাড়ি যান। তার শ্বশুরবাড়ি ভালুকার কাছেই বদরগঞ্জে। কিন্তু

আফরোজাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বরং নতুন করে দাবি করা তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় আফরোজাকে মারধর এবং তুমুল গালিগালাজ করেন তার শাশুড়ি। এসব দেখেও সাইফুল চুপচাপ ছিলেন, কোনো প্রতিবাদ করেননি।

আফরোজার মতে, সাইফুলের এই নির্লিপ্ততায় ঝগড়া আরও বেড়ে যায়। সে সময় আফরোজা তার মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশী অন্তু মিয়ার কাছে যান। নিয়মিত মারধরের ব্যাপারে আফরোজার কাহিনী শুনে অন্তু মিয়া হতাশ হন। তখন তিনি পরামর্শ দেন আফরোজার উচিত শ্বশুরবাড়িতে থাকার চেষ্টা করা। কারণ এটি তার মৌলিক অধিকার। আফরোজা দৃঢ়চিত্তে ফিরে গিয়ে জোর করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই তার শাশুড়ির সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়। গ্রামের লোকজন জড়ো হন। অন্তু মিয়া এবং তার স্ত্রী, যিনি ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য, তারাও আফরোজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। তারা আফরোজার শাশুড়িকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনো কাজ হয় না। আফরোজার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি বাবার বাড়ি ফিরে আসেন।

অন্তু মিয়া সহায়তার জন্য আফরোজার পাশেই ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় নিজের বাড়িতে তিনি একটি সালিশ বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আফরোজার মা রাজি হননি, কারণ তার মনে হয়েছে প্রতিবেশী হওয়ার কারণে অন্তু মিয়া সাইফুলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন। আফরোজার মা ভেবেছিলেন এই সালিশের চেয়ে সাইফুলের এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়াই ভালো হবে। কারণ স্থানীয় লোকজনের ওপর চেয়ারম্যানের প্রভাব রয়েছে। তাই তিনি আফরোজাকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে যান। চেয়ারম্যান তখন বিষয়টি দেখবেন বলে আফরোজার মাকে আশ্বস্ত করেন। এভাবে প্রতিদিন মারধর করা মানা যায় না বলে হতাশাও প্রকাশ করেন চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের ধারণা, মূল ঝামেলা আফরোজা ও তার শাশুড়ির মধ্যে, সাইফুলের সঙ্গে কোনো ঝামেলা নেই। এছাড়াও তিনি মনে করেন, সাইফুলের চেয়ে সাইফুলের মায়ের দোষ বেশি। আফরোজার শাশুড়িকে তিনি একজন বদমেজাজী ও একগুঁয়ে নারী হিসেবে উল্লেখ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার পেছনে আফরোজার মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুরবাড়িতে থাকার সুযোগ পাওয়া। কারণ আফরোজা মনে করতেন এটি তার অধিকার। সহিংসতা বন্ধ হলো কি হলো না—তা মুখ্য নয়। সহিংসতা বন্ধের চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকা এবং বিয়ে টিকিয়ে রাখাকে আফরোজা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তার অনুরোধের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা প্রথম সালিশ বসান। সেখানে সাইফুলের পরিবারকে তলব করা হয়। ওদিকে আফরোজা ও তার মা স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ায় অন্তু মিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ারম্যানের ডাকা সালিশে যাননি।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফার সালিশে সাইফুল ও তার পরিবার যাননি। আফরোজার মা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ওপর ভরসা হারিয়ে স্থানীয় ছাত্রনেতা নিজের দেবরের কাছে সালিশ প্রক্রিয়ার ধীরগতির ব্যাপারে নালিশ জানান। ওই ছাত্রনেতা তখন চেয়ারম্যানকে ফোন করে সালিশের প্রক্রিয়া দ্রুত করার তাগিদ দেন। এরপর চেয়ারম্যান তৃতীয় দফায় সালিশ ডাকলেও সাইফুল ও তার পরিবার না আসায় এবারও সালিশ ব্যর্থ হয়। চেয়ারম্যান তখন সাইফুলের পরিবারকে কড়া ভাষায় জানান এবার সালিশে না এলে সাইফুলকে বাড়ি থেকে তুলে আনা হবে।

কিন্তু তবু সাইফুল সালিশে যাননি। এরপর চেয়ারম্যান গ্রাম পুলিশ পাঠিয়ে সাইফুলের পরিবারকে আসতে বাধ্য করেন।

সালিশে উভয় পরিবার যে বিষয়গুলো তুলে ধরেন—সাইফুলের ঋণ পরিশোধ, মারধর বন্ধ এবং বিয়ে টিকিয়ে রাখতে আফরোজার ইচ্ছা। ভালুকায় থাকার সময় সাইফুল বাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই এলাকা ছেড়ে আসার আগে তিনি ঋণ পরিশোধ করে আসেননি। আফরোজা এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর আলোচনা হয় কীভাবে ঋণ পরিশোধ করা হবে। স্ত্রীকে একা ফেলে সাইফুলের চলে আসা, স্বামী হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা এবং আফরোজাকে মারধর করার জন্য চেয়ারম্যান সাইফুলকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। সালিশে সাইফুল ও তার পরিবারকে আফরোজার ওপর নির্যাতন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আফরোজাকেও তার বাড়াবাড়ির জন্য শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। এর প্রয়োজন ছিল না জেনেও আফরোজা ক্ষমা চান—কারণ তার বয়স্ক শ্বশুর-শাশুড়িকে তিনি অসম্মান করতে চাননি। সালিশে সাইফুল আফরোজাকে ফিরিয়ে নিয়ে সংসার করতে রাজি হন। তবে সালিশের পর সেই সিদ্ধান্ত না মেনে সাইফুল ও তার পরিবারের সদস্যরা আফরোজাকে রেখেই চলে যান। কোনো উপায় না পেয়ে আফরোজা বাবার বাড়ি ফিরে আসেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সালিশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হওয়ায়—আফরোজা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে সাহায্য চান। আফরোজার বাবা-মায়ের বাড়ির পাশেই ব্র্যাকের ভালুকা কার্যালয় অবস্থিত। তাছাড়া ব্র্যাকের হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সার্ভিসের (এইচআরএলএস) কর্মকর্তাও তাদের প্রতিবেশী ছিলেন। ফলে তাদের পক্ষে দ্রুত যোগাযোগ করা সহজ হয়। আফরোজা ও তার মা তখন ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কাছে সাহায্য চান। ব্র্যাক বিষয়টিকে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না করা এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ব্র্যাক থেকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। মধ্যস্থতার জন্য ব্র্যাক দুটি নোটিশ পাঠায়। তবে সাইফুল কোনো উত্তর দেননি, দেখাও করেননি। এরপর ব্র্যাক তৃতীয় আরেকটি নোটিশ পাঠায় মধ্যস্থতার জন্য। কিন্তু করোনা অতিমারিতে এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

২০২০ সালের মে মাসে (রমজান মাসে) আফরোজা কানাঘুষায় জানতে পারেন, সাইফুল আরেকটি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এরপর আফরোজা শ্বশুরবাড়ি গেলে সাইফুল তাকে তালাক দিচ্ছেন বলে একটি নোটিশ ধরিয়ে দেন। আফরোজা ভয়ে সেটা পড়েননি। তার ভয় ছিল নোটিশটি পড়লেই হয়তো তালাক হয়ে যাবে। তালাকের পরও স্বামীর বাড়ি থাকতে চাওয়ায় আশপাশের লোকজন এসে আফরোজাকে অপমান করেন। তালাকের পর স্বামীর বাড়িতে থাকা হারাম বলে আফরোজাকে অপমান করা হয়। এই অপমানের পরও আফরোজা তার শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে রাজি হননি। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তখন তাকে একটি ঘরে আটকে রাখেন। আফরোজা ঘরের ভেতর একটি পাত্রে প্রস্রাব করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। আফরোজা জানান, তার শাশুড়ি তাকে ভয় দেখাতে স্থানীয় কিছু ছেলেকে বাড়িতে ডেকে এনে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাখেন। আফরোজা ভয় পান, তার শাশুড়ি বোধহয় এই ছেলেদের তাকে ধর্ষণ করতে বলবেন। আফরোজার দাদিশাশুড়ি একই বাড়িতে থাকতেন। তার হস্তক্ষেপে এরপর ছেলেগুলো বাড়ি ছেড়ে যায়।

আফরোজা তালাকের চিঠি পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, কারণ এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেওয়া উচিত সে বিষয়ে আফরোজা পরামর্শের জন্য অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। শ্বশুরবাড়িতে বন্দি থাকা অবস্থায় নিজের মা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ব্র্যাকের কর্মকর্তাকে (যিনি তার আবেদন জমা দিয়েছিলেন) ফোন করেন আফরোজা। সবাই তাকে আশ্বস্ত করে বলেন কাগজে স্বাক্ষর না করায় তালাক কার্যকর হয়নি। নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে সবাই তাকে পরামর্শ দেন। মা ছাড়া বাকিদের কথায় মনে হয়নি তারা আফরোজার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। একই সঙ্গে কেউ বলেননি যে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে বন্দি করে অপরাধ করেছেন। তালাকের ক্ষেত্রে আফরোজাকে নোটিশ গ্রহণ করতে হবে, শুধু তালাক মেনে নেওয়া বা স্বাক্ষর করা যথেষ্ট নয়—এ তথ্যও কেউ তাকে দেননি। সবার পরামর্শ মেনে শ্বশুরবাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আফরোজা। অন্যদিকে নিজের মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন আফরোজার মা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সিমির কাছে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধারের আবেদন জানান। ইউপি সদস্য এবং আফরোজার মা থানায় গিয়ে সেদিন রাত ১১টায় পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করেন। পুলিশের পরামর্শমতে তারা একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

যেদিন সকালে আফরোজাকে ঘর থেকে মুক্ত করা হয়, সেদিনই তিনি শ্বশুরবাড়ি ছাড়বেন না বলে জানিয়ে দেন। তার শ্বশুর তখন রাগে ফেটে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে আফরোজাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে আফরোজার মা পুলিশে খবর দিয়েছিলেন আফরোজাকে উদ্ধার করতে। পুলিশ দেখে আফরোজার শ্বশুর পালিয়ে যান। পুলিশ এসে জানায় এই বাড়িতে আফরোজার থাকার অধিকার আছে কারণ তালাক কার্যকর হয়নি। এছাড়া পুলিশও পরামর্শ দেয় আফরোজার হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দেনমোহরের তিন লাখ টাকা তিনি যেন অবশ্যই নিয়ে যান। বাকি টাকা ছিল দুই লাখ আশি হাজার। সেই টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বাড়ি না ছাড়ার পরামর্শও দেওয়া হয়। তবে আফরোজার মা শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে তাকে ভালুকা নিয়ে যান। আফরোজার মা জানান, সহায়তার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে তিনি নয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন। পুলিশকে টাকা দেওয়া ছাড়াও আফরোজার মা নিজ গ্রাম থেকে সাইফুলের গ্রামে যাওয়া, ইউনিয়ন পরিষদে যাওয়া ইত্যাদি কারণে যাতায়াত খরচ বাবদ টাকা খরচ করেছেন। এসব বাবদ আরও দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

ভালুকায় ফিরে আসার পর আফরোজা ও তার মা ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ব্র্যাক এইচআরএলএসের কর্মীর সহায়তায় ব্র্যাকের একজন প্যানেল আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন। তারা জানতে পারেন যে, ইতোমধ্যে সাইফুল আরেকটি বিয়ে করেছেন। আইনে বলা থাকলেও, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আফরোজাকে তিনি কোনো নোটিশ দেননি। ব্র্যাকের পরামর্শ অনুযায়ী আফরোজা সিদ্ধান্ত নেন যে, যৌতুকের টাকা ও বিবাহকালীন ভরণপোষণের খরচ এবং তালাকের পর আরও তিন মাস ভরণপোষণের খরচ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করবেন।

মামলার প্রথম শুনানি হয়েছে ২০২১ সালের ১ মার্চ। সাইফুল প্রথম আদালতে হাজিরা দেন ২০২১ সালের ১০ মার্চ। এরপর আবারও ২০২১ সালের ২৫ মার্চ তিনি হাজিরা দেন। মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লেগেছিল। বিলম্ব হওয়ার আরও কারণ হলো আফরোজার

আইনজীবী দেশের বাইরে ছিলেন। করোনা অতিমারির কারণে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি সময়মতো দেশে ফিরে আসতে পারেননি। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাইফুল সৌদি আরবে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে চলে যান (আইনি ভাষ্য ১ দেখুন)। যাওয়ার আগে সাইফুল আফরোজাকে কিছু বলেও যাননি, টাকাও দিয়ে যাননি। আফরোজা তার চাচি শাশুড়ির কাছ থেকে জেনেছেন সব। নতুন এসব ঘটনায় আফরোজা ও তার পরিবারের সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্র্যাকের এইচআরএলএস আফরোজাকে পরামর্শ দিচ্ছে। আফরোজা যদি সাইফুলের অবস্থান জানতে পারেন, তাহলে এইচআরএলএস বিদেশে সাইফুলের চাকরির নিয়োগকর্তাকে নোটিশ পাঠাতে পারবে।

আইনি ভাষ্য ১

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজ দেশে প্রত্যর্পণ করা সাধারণত খুব একটা ঘটে না। অনেক সময় ফৌজদারি মামলায় হয়ে থাকে, কিন্তু তা-ও খুব সংবেদনশীল মামলা হলে। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলায় কাউকে প্রত্যর্পণ করা হলেও অভিবাসী হিসেবে তার অধিকার লঙ্ঘিত হবে না।

উপসংহার

পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও আফরোজা ও তার পরিবার বিয়ে টিকিয়ে রাখা এবং স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সালিশকাররাও স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাননি। আফরোজা তার স্বামীর তালাকের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ এবং শ্বশুরবাড়িতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। শ্বশুরবাড়িতে একটি কক্ষে বন্দি থাকার পরও আফরোজা অনেক সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সহায়তা ও পরামর্শের জন্য বিভিন্ন পরিচিতজনকে ডেকে এনেছেন। তবে সাইফুল যখন আরেকটি বিয়ে করে ফেলেন, তখন তার ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তখন বিয়ে টিকিয়ে রাখতে আফরোজা আর আগ্রহ দেখাননি। হতাশ হয়ে আফরোজা এখন আইনি পদ্ধতিতে তার দেনমোহরের টাকার ব্যাপারে সমঝোতার অপেক্ষায় আছেন। তবে বিষয়টি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কঠিন, কারণ সাইফুল আবারও বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

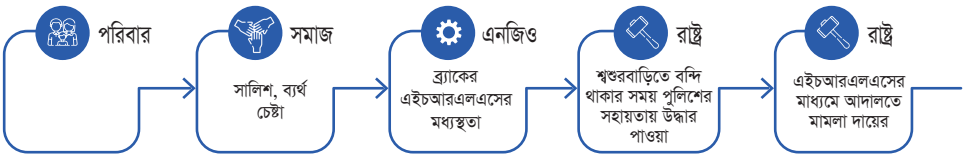

তালাকপ্রাপ্ত এক নারীর বিপন্নতা

দিলরুবা

দুইজন প্যানেল আইনজীবী এবং ব্লাস্টের একজন প্যারালিগ্যাল পটুয়াখালীর মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রবেশ করছেন। দিলরুবার স্বামী হাবিব মধ্যস্থতায় হাজির হননি। মামলা দায়ের এবং আদালতে দিলরুবার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্লাস্ট একজন প্যানেল আইনজীবী নিযুক্ত করে।

খ. তালাকপ্রাপ্ত এক নারীর বিপন্নতা: দিলরুবা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সৎ ছেলের কাছে যৌন হয়রানির শিকার, অভিবাসন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, যৌতুক নিরোধ আইন, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের বিপন্নতা

ভূমিকা

দিলরুবার দ্বিতীয় স্বামী হাবিব। দিলরুবা তার দ্বিতীয় স্বামী এবং স্বামীর আগের সংসারের মেয়ে ও ছেলের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাকে মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন করা হয়। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে যতবার দিলরুবার সঙ্গে তার সৎ মেয়ের কথা কাটাকাটি হয়েছে, ততবারই তার স্বামী হাবিব নিজের মেয়ের পক্ষ নিয়ে দিলরুবাকে মারধর করেছেন। দিলরুবার নামে হাবিব ঋণ নিতেন। ঋণ আদায়কারীরা এসে দিলরুবাকে কিস্তির জন্য খুঁজতেন। দিলরুবার সৎ ছেলেদের মধ্যে সবার বড়জন তাকে যৌন হয়রানি করে। এই যৌন নির্যাতনের কথা দিলরুবা স্বামীকে বলতে পারেননি লজ্জায়। ফলে তিনি আরও বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। তবু দিলরুবা নীরবই থেকেছেন। হয়রানি যখন জনসম্মুখে ঘটতে শুরু করে, তখন তিনি সালিশ ডাকেন। কিন্তু তার সৎ ছেলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপর তিনি সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। দিলরুবা তার বাবার আর্থিক সহায়তা আর বোনের নৈতিক সমর্থন পান। পরে তিনি তালাক দিয়ে নিজের দেনমোহরের টাকা ফেরত পান।

বৃত্তান্ত

দিলরুবার বয়স ৩১। তিনি পটুয়াখালীতে থাকেন। তার বাবা সুযোগ পেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। মা ভিক্ষা করার পাশাপাশি মানুষের বাড়িতে কাজকর্ম করে উপার্জন করেন। তার আরও দুই ভাই এবং এক বোন আছে। বোনের বিয়ে হয়েছে, তিনি ঢাকায় থাকেন। বড় ভাই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ছোট ভাই কোরআনে হাফেজ, পাশাপাশি তিনি একটি পোশাক কারখানায় কাজ

করেন। দিলরুবা পঞ্চম শ্রেণির বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি—কারণ তার বাবা-মা উপার্জনের জন্য তাকে অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করতে পাঠিয়ে দেন। তেরো বছর বয়সে দিলরুবার প্রথম বিয়ে হয়। আগের সংসারে তার দুটি ছেলেসন্তান রয়েছে। কিন্তু তারা তার আগের স্বামীর সঙ্গেই থাকে। কারণ তাদের দেখাশোনা করার সামর্থ্য দিলরুবার নেই। তিনি যখন দ্বিতীয় স্বামী হাবিবের সঙ্গে ঢাকায় থাকা শুরু করেন, তখন মানুষকে ঋণ হিসেবে টাকা দিতেন। অন্যদিকে তার স্বামী বালুর ব্যবসার ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন।

কেস

২০১৫ সালে হাবিব সিকদারের সঙ্গে দিলরুবার বিয়ে হয়। এটি ছিল দিলরুবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং হাবিবের পঞ্চম বিয়ে। হাবিবের বয়স প্রায় দিলরুবার বাবার সমান। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। দিলরুবার দুলাভাই হাবিবের সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে, দিলরুবাকে বলা হয়েছিল হাবিব মূলত তার ছোট ছেলের দেখাশোনার জন্য এই বিয়ে করছেন। কারণ হাবিবের স্ত্রী মারা গেছেন। এ কারণে পাত্রপক্ষ কোনো যৌতুক দাবি করেনি। যেহেতু নিজের দুই সন্তানকে দিলরুবা লালনপালন করতে পারেননি, তাই হাবিবের সন্তানের প্রতি তার মায়া হয় এবং লালনপালন করতে রাজি হন। বিয়েতে এক লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল। বিয়ের দিনই দিলরুবা তার স্বামী ও স্বামীর সবচেয়ে ছোট ছেলেসহ পটুয়াখালী থেকে ঢাকায় চলে আসেন। দিলরুবা ভেবেছিলেন হাবিবের স্ত্রী মারা গেছেন এক সন্তান রেখে। কিন্তু ঢাকায় আসার পর জানতে পারেন এর আগে হাবিব আরও চারটি বিয়ে করেছেন। দিলরুবা তার পঞ্চম স্ত্রী। আগের স্ত্রীদের ব্যাপারে দিলরুবা কিছুই জানতেন না। এদিকে হাবিবের একটি নয়, চারটি সন্তান। তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে। হাবিবের সবার বড় ছেলে ও মেয়ে দুজনই বিবাহিত। তারাও হাবিবের সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। দিলরুবা তার পরিবারকে বিষয়টি জানান। তার পরিবার পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

বিয়ের প্রথম বছর থেকেই দিলরুবার সংসারজীবনে সমস্যা শুরু হয়। দিলরুবার সৎ মেয়ের সঙ্গে তার তর্কাতর্কি হতো। এর ফলে দিলরুবার স্বামীর সঙ্গেও তার সমস্যা হতো। হাবিব তার মেয়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতেন। তর্কাতর্কি শুরু হলে হাবিব দিলরুবাকে গালিগালাজ করতেন। পারিবারিক পর্যায়ে দিলরুবা বেশ কয়েকটি সালিশ ডাকেন, যেন তার সৎ মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট করা যায়। কিন্তু এতে কাজ হয়নি। সৎ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত ঝগড়া চলমান ছিল।

> “
> আমার স্বামী খারাপ ভাষায় আমাকে অভিশাপ দিতেন। তাছাড়া আমাকে তিনবার মারধর করেছেন। তার মেয়েও আমার সঙ্গে একই ব্যবহার করতো। সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতো। যখনই আমি কিছু বলতে যেতাম, আমার স্বামী তার মেয়েকে কিছু না বলে উল্টো আমাকে মারধর করতেন।
>
> — দিলরুবা

দিলরুবার কাছে সহিংসতা মূল সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল হাবিব তার নামে টাকা ঋণ নিতেন। সেই ঋণের টাকা দিলরুবাকে শোধ করতে হতো। ঢাকায় আসার একদিনের মধ্যে দিলরুবার নামে হাবিব টাকা ঋণ নেন। ২০২০ সালের মধ্যে দিলরুবার নামে চারটি ঋণ নেওয়া হয়। এগুলো শোধ করার দায়ভার পড়ে দিলরুবার কাঁধে। হাবিবের ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধ করার জন্য দিলরুবাকে ফোন করতেন। এসব সমস্যা সমাধানে হাবিব যেখানে কাজ করেন, দিলরুবা সেখানে তার সহকর্মীদের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিলেন—যেন এ বিষয়ে কিছু একটা করা যায়। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। ২০২০ সালের শুরুর দিকে ষাট হাজার টাকার একটি ঋণকে কেন্দ্র করে হাবিব ও দিলরুবার মধ্যে ঝগড়া হয়। সেই ঋণ থেকে দিলরুবা দশ হাজার টাকা চান তার বাবার চিকিৎসার জন্য। কিন্তু হাবিব কোনো টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে ব্যাপক তর্কবিতর্ক হয়—আর সেখান থেকেই পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নেয় (আইনি ভাষ্য ২ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ২

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের অধীনে ঋণের ব্যবহার ও পরিশোধসংক্রান্ত নির্যাতনকে অর্থনৈতিক নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দিলরুবাও এই অর্থনৈতিক নির্যাতনকে সঠিক মনে করেননি, কিন্তু এ থেকে মুক্তির পথও খুঁজে পাননি। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীও এই বিষয়টিকে কাজে লাগাতে চাননি।

এর পরপরই দিলরুবার বড় সৎ ছেলে তাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করেন। রাতে দিলরুবা হাবিবের সঙ্গে ঘুমাতেন না। ছোট সৎ ছেলেকে নিয়ে তিনি আলাদা আরেকটি কক্ষে ঘুমাতেন। এই সুযোগে তার বড় সৎ ছেলে তার সঙ্গে যৌনমিলনের চেষ্টা করেন। এই ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটে। একদিন রাতে দিলরুবার সৎ মেয়ে ও তার স্বামী সবার বড় সৎ ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। দিলরুবা তার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে যৌন হয়রানি বন্ধে সালিশের ব্যবস্থা করেন। তিনি আশা করেছিলেন হাবিব তার ছেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু হাবিব দিলরুবার অভিযোগ বিশ্বাস করেননি। তাই কোনো ব্যবস্থাও নেননি। এসব নিয়ে দিলরুবা ক্ষুব্ধ ছিলেন। রাগ করে এরপর দিলরুবা তার এক বোনের সঙ্গে থাকা শুরু করেন। সেখানে তার এক ধর্মছেলে দিলরুবাকে স্বামীর বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য রাজি করান। তাকে বলেন, যদি দিলরুবা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়, তাহলে তা সবাইকে জানানো উচিত; পালিয়ে আসা উচিত নয়। এরপর দিলরুবা তার স্বামীর বাড়ি ফিরে যান। তিনি তার নিজের বোনকে সব খুলে বলেন। কিন্তু ঘটনার ধরন এমন যে দিলরুবা তার বাবাকে কিছুই বলতে পারেননি।

অবশ্য এ ব্যাপারে দিলরুবা তার বোনের সহায়তা পান। তার বোন দিলরুবার স্বামীর বাড়ি গিয়ে হাবিব ও তার পরিবারকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। আর যদি তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারেন, তাহলে দিলরুবা তালাক দেবেন বলে জানান। কারণ দিলরুবাকে দেখাশোনা করার সামর্থ্য তার আছে বলে জানান। দিলরুবার বোন আরও বলেন, কষ্টের মধ্য দিয়েই দিলরুবা বড় হয়েছে। তিনি তার বোনকে এই নির্যাতন আর সহ্য করতে দেবেন না।

দিলরুবার স্বামী ও সৎ ছেলেমেয়েরা তখন দিলরুবাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু তারা কিছুই করেননি। দুই সপ্তাহ পরও দিলরুবার পরিবার যখন দেখল হাবিব নিজের কথা রাখছেন না, তখন দিলরুবার বাবা ২০২০ সালের মার্চ মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন—যেন দিলরুবা নিজেই চলে আসতে পারেন। এই ঝগড়ার পরও হাবিব লকডাউনের এক সপ্তাহ আগে ২০২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা থেকে পটুয়াখালী এসে দিলরুবার বাপের বাড়ি থেকেছেন।

হাবিব ও তার পরিবার তাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল। গ্রামে তাদের কোনো বাড়িঘর ছিল না, যদিও সেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন বসবাস করতেন। হাবিব গ্রামে গেলে দিলরুবাদের বাড়িতেই থাকতেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ার পর যখন 'সাধারণ ছুটি' ঘোষণা করা হয়, দিলরুবা ও হাবিব দুজনই পুরো মাস দিলরুবাদের বাড়িতেই থেকেছেন। কারণ হাবিবের কোনো আয়রোজগার ছিল না। সে সময় দিলরুবার মা-ই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী। পুরো পরিবারকে দিলরুবার মা ভিক্ষা করে খাইয়েছেন। ভিক্ষা করে আনা উপার্জন দিয়েও দিলরুবার মা চেয়েছেন জামাতা হিসেবে হাবিব যেন ভালোমন্দ খেতে পারে। সেখানে থাকার সময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। লকডাউন শেষ হলেই দিলরুবাকে ঢাকায় ফিরিয়ে নেবেন বলে হাবিব প্রতিশ্রুতি দেন। অথচ যখন লকডাউন উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন হাবিবের একটি বালুভর্তি কার্গো নৌকা আসে। দিলরুবাকে রেখে সেই নৌকায় হাবিব ঢাকায় চলে আসেন।

দিলরুবার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু যতদিন ঋণ পরিশোধের বিষয়টি না মিটবে, ততদিন দিলরুবা ফিরে যেতে রাজি হননি। ঋণের সমস্যা মেটানোর জন্য তার দেবর পারিবারিক সালিশ বসান। দিলরুবার দেবর তাকে অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু দিলরুবা অস্বীকৃতি জানান। মতের মিল না হওয়ায় দেবরের সঙ্গে দিলরুবার সম্পর্ক খারাপ হয়। তার পূর্বপর্যন্ত দেবর তার পক্ষেই ছিলেন। সালিশ ব্যর্থ হওয়ার পর হাবিব দিলরুবার বাবার সঙ্গে টেলিফোনে খারাপ ব্যবহার করেন। দিলরুবার বাবা রেগে দিলরুবাকে এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তা না হলে তিনি দিলরুবার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না বলে জানিয়ে দেন। এরপর দিলরুবা আইনি সহায়তা পেতে চেষ্টা করেন। তার বাবাই তাকে একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে নিয়ে যান। জমিসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য তার বাবা এই আইনজীবীর কাছে আগেও গিয়েছিলেন। দিলরুবার কাহিনী শুনে আইনজীবী তাদের বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টে (ব্লাস্ট) যেতে বলেন। কারণ সেই আইনজীবী জানতেন যাদের আইনি সেবা নেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই, ব্লাস্ট তাদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। তিনি এ-ও জানতেন দিলরুবাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ২০২০ সালের মে মাসে তারা ব্লাস্টের কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। তখন লকডাউন চলছিল। দিলরুবা ও তার পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে, লকডাউন উঠে গেলে যেন তারা ব্লাস্টের কার্যালয়ে আসেন।

২০২০ সালের আগস্ট মাসে দিলরুবা ব্লাস্টের পটুয়াখালী কার্যালয়ে যান। হাবিবের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে একটি আবেদন দাখিল করেন। ব্লাস্টের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পথ দেখানো হয়। দিলরুবা তখন মধ্যস্থতার প্রস্তাবে রাজি হন। মধ্যস্থতার জন্য ব্লাস্ট একটি তারিখ ঠিক করে হাবিবকে নোটিশ পাঠায়। ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মধ্যস্থতায়

দিলরুবা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হাবিব আসেননি। দিলরুবা জানান তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবসময় বলতেন দিলরুবা এবং তার পরিবার কখনোই কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় জয়ী হতে পারবেন না। কারণ তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। প্রতিবার আদালতে গেলে তার বাবার একদিনের রোজগার খরচ হতো। সেজন্য দিলরুবার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মনে করতেন, দিলরুবার পরিবার বেশিদিন আইনি প্রক্রিয়া চালাতে পারবে না। ফলে একটা সময় এমনিতেই তারা থেমে যাবেন। তারা হিসাব কষে দেখেছিলেন দিলরুবা ও তার পরিবারের তিনশ টাকা খরচ হবে যদি একদিন আদালতে যায়। এর মধ্যে একশ পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে যাতায়াতে আর একশ পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে খাওয়ার পেছনে।

হাবিব যখন মধ্যস্থতায় আসেননি, ব্লাস্ট তখন আইনগতভাবে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নেয়। এ বিষয়ে কাজ করতে এবং আদালতে দিলরুবার প্রতিনিধিত্ব করতে প্যানেল আইনজীবী অ্যাডভোকেট জুনাইদকে নিযুক্ত করা হয়। দিলরুবা অ্যাডভোকেট জুনাইদকে জানান হাবিব তার দেখাশোনা করেন না। তার সৎ ছেলে ও মেয়ে তাকে 'নির্যাতন' করে। সেজন্য দিলরুবা তাদের সঙ্গে থাকতে চান না। দিলরুবার সঙ্গে কথাবার্তার পরে অ্যাডভোকেট জুনাইদ বলেন,

> তিনি (দিলরুবা) বলেন, 'সে (হাবিব) আমার দেখাশোনা করে না, তার আগের সংসারের সন্তানরা আমাকে নির্যাতন করে।'

এরপর অ্যাডভোকেট জুনাইদ যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ নম্বর ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন (আইনি ভাষ্য ৩ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ৩

বাস্তবে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের যেসব আইনজীবী আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তারা সাধারণত পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের পরিবর্তে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা দায়ের করার পরামর্শ দেন। যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা করলে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের হুমকির একটি বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। আর যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আরও বেশি সাজা ভোগ করতে হয়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের বিপরীতে যৌতুক নির্মূল আইনের আওতায় মামলা করলে তা জামিন-অযোগ্য। বাস্তবে জামিন-অযোগ্য মামলায় প্রথম ধাপে মাননীয় আদালত জামিন খারিজ করে দেন আর বিবাদী সে সময় হাজতেই থাকেন। তবে যেখানে যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে এবং আদালত যদি সেসব ভিত্তির সঙ্গে একমত পোষণ করেন, তাহলে মাননীয় আদালত নিজস্ব ক্ষমতাবলে জামিন দিতে পারেন। আরেকটি পথ হলো– বিবাদী যদি এরই মধ্যে পুলিশের হাজতে না থাকেন, কিন্তু ভবিষ্যতে গ্রেপ্তার করা হবে বলে মনে করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মহামান্য উচ্চ আদালত থেকে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে আগাম জামিন নেওয়ার চেষ্টা করেন।

পারিবারিক সহিংসতায় ভুক্তভোগীরা বিজ্ঞ আইনজীবী বা আইনি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করেন যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। এজন্যই পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের পরিবর্তে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা করা হয়। যখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়, তখন দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার পরিধিও যৌতুক

নিরোধ আইনে বেশি থাকে। এটিও এই আইনে মামলা দায়ের করার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ। আরেকটি কারণ হলো, যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা করলে বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযুক্তকে মাননীয় আদালতে হাজির করা নিশ্চিত করতে পারেন। কারণ এই আইনের আওতায় গ্রেপ্তারের সুযোগ বেশি থাকে। বিপরীতে, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের আওতায় অপরাধী স্বামীকে আদালতে হাজির করা কঠিন। কারণ এই আইনে প্রাথমিক যেসব প্রতিকারমূলক আদেশ দেওয়া হয়, সেগুলোর ধরন নাগরিক প্রতিপালনমূলক। অপরাধমূলক দায় তখনই আনা যায়—যদি মাননীয় আদালতের আদেশ অমান্য করা হয়, তাছাড়া নয়। এছাড়াও, মামলায় আইনি লড়াই করছেন—এমন বহু বিজ্ঞ আইনজীবী পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত নন। এই আইন বোঝার ক্ষেত্রেও তাদের ঘাটতি রয়েছে। মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদের জন্য ব্লাস্ট স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করেছে। নির্দেশিকা তৈরির উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞ আইনজীবীরা যেন মক্কেলদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, তাদের চাহিদা বুঝতে পারেন এবং সে অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক আইন ব্যবহার করতে পারেন। যৌতুক নিরোধ আইনের বদলে অনেক সময় মক্কেলরা পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসেবে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান ব্যবহার করার অনুরোধ করেন। কারণ তারা এই আইনের সঙ্গে বেশি পরিচিত।

অ্যাডভোকেট জুনাইদ কেন পারিবারিক সহিংসতাবিষয়ক আইনের পরিবর্তে যৌতুক নিরোধ আইন ব্যবহার করেছিলেন? সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পারিবারিক সহিংসতাবিষয়ক আইনে মক্কেলকে খুব একটা সুবিধা দিতে পারবেন না। কারণ এই আইন দিয়ে অপরাধীকে ধরা যাবে না (আইনি ভাষ্য ৪ দেখুন)। তিনি বলেন,

“

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের অধীনে এই মামলা দায়ের করে কোনো লাভ হবে না। গ্রামীণ একটি প্রবাদ আছে, যদি তুমি কাউকে ধরতে চাও তাহলে শক্ত করে ধর।

আইনি ভাষ্য ৪

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের বিপরীতে যৌতুক নিরোধ আইনের অপরাধগুলো জামিন-অযোগ্য। যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় যখন কোনো মামলা দায়ের করা হয়, তখন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের হুমকির সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়াও, যদি অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে কারাবরণ করতে হয়। বাস্তবে জামিন-অযোগ্য মামলায় প্রথম ধাপে মাননীয় আদালত জামিন খারিজ করে দেন আর বিবাদী ইতোমধ্যে হাজতেই থাকেন। সেজন্য সহিংসতার শিকার নারীরা যৌতুক নিরোধ আইনের আশ্রয় নেন। কারণ, এর ফলে অভিযুক্তকে তুলনামূলক কঠোর সাজা দেওয়া যায়। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের হুমকি দিয়ে ঝুলে থাকা ভরণপোষণের দাবি দ্রুত আদায় বা সমঝোতা করা যায়। অন্যদিকে, বিজ্ঞ আইনজীবীরাও যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা করলে অভিযুক্তকে সহজেই মাননীয় আদালতে হাজির করতে পারেন। কারণ এই আইনের আওতায় গ্রেপ্তারের সুযোগ রয়েছে।

প্রথম জ্যেষ্ঠ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দিলরুবার মামলাটি দায়ের করা হয়। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী, মাননীয় আদালত বিচারের আগে একটি সালিশের ব্যবস্থা করেন। আরেকটি পদ্ধতি হলো ১৯০৮ সালের সিভিল প্রসিডিউর সংবিধির ৮৯(ক) ধারা। এ ধারা মোতাবেক সালিশের জন্য মাননীয় আদালত বিষয়টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বা জেলা জজের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারীদের একটি প্যানেল গঠন করেন। সেখান থেকে মাননীয় আদালত বিষয়টি একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছে পাঠাবেন অথবা আদালত নিজেই মধ্যস্থতা করবেন। পরে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলাটি বিচারের আগে মধ্যস্থতার জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠান।

যদিও বিয়ের সময় দেনমোহর বাবদ এক লাখ টাকা ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যস্থতার সময় অ্যাডভোকেট জুনাইদ আশি হাজার টাকা দাবি করেন। কারণ হাবিব ও তার পরিবার জানায় তাদের এক লাখ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। শুরুতে হাবিব মাত্র বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। এরপর দিলরুবা ও তার পরিবার ষাট হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু হাবিব জানান তিনি এই পরিমাণ টাকাও শোধ করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত দুই পরিবার একমত হয় যে দেনমোহর বাবদ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হাবিব পরিশোধ করবেন এবং দুই পক্ষই তালাক মেনে নেবেন। দিলরুবা খুলা তালাকে রাজি হন (আইনি ভাষ্য ৫ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ৫

মুসলিম আইনে বিবাহিত কোনো নারী তার স্বামীকে নিজের সম্মতিতে তালাক দিতে পারেন। এ প্রক্রিয়াকে 'খুলা' তালাক বলে। যেসব ঘটনায় স্ত্রীকে খোলাখুলিভাবে তালাক দেওয়ার অধিকার স্বামীর ওপর অর্পিত নয়, সেখানে এই প্রক্রিয়া সাধারণত ব্যবহৃত হয়। নিকাহনামার ১৮ নম্বর ধারায় বিষয়টি বর্ণিত থাকে।

এসব শর্ত পূরণ করার পর মামলা তুলে নেওয়া হয়। ব্লাস্টের নথিপত্র থেকে দেখা যায়, দিলরুবা তার বিবাদী স্বামীর কাছ থেকে দুই কিস্তিতে পঞ্চান্ন হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন। দিলরুবা নিজে নিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। মামলা তুলে নেওয়ার খরচ এবং কাজীর খরচ হাবিবকে দিয়ে পরিশোধ করিয়েছেন। বাস্তবে খুলা তালাকের ক্ষেত্রে দুই পক্ষই তালাকের প্রক্রিয়ার খরচ বহন করে। সেজন্য টাকার মোট পরিমাণ থেকে পাঁচ হাজার টাকা কেটে রাখা হয়েছে। নিজের ভূমিকা পালনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট জুনাইদ বলেন,

> "সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার মক্কেলের চাওয়াই আমার লক্ষ্য। আমি মক্কেলকে সহায়তা করতে চেষ্টা করি, তাদের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করি। তাদের ইচ্ছা পূরণ করি। এটাই আমার লক্ষ্য।

শুরুতে দিলরুবা ও তার বাবা এসবের ফলাফল নিয়ে খুশি ছিলেন। তবে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ফলোআপ সাক্ষাৎকারে দিলরুবা জানান, যদি তিনি বুঝতে পারতেন যে টাকা পাওয়া এত সহজ হবে, তাহলে আরও বেশি টাকার জন্য দেনদরবার করতেন। আদালতের অভিজ্ঞতার পর

দিলরুবা একই রকম ঘটনায় আরও দুজন নারীকে আইনি সহায়তা পেতে সাহায্য করেছেন। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে যখন আমরা দিলরুবাকে দেখতে গেলাম, দেখলাম গ্রামের আরও দুজনের সঙ্গে মিলে দেনমোহরের টাকা দিয়ে তিনি একটি ধান মাড়াইয়ের মেশিন কিনেছেন। এছাড়াও তিনি দুই শতাংশ জমি কিনেছেন যেখানে তার বাবা ও ভাই কাজ করেন।

দিলরুবা কয়েক মাস আগে আবার বিয়ে করেছেন। তার বর্তমান স্বামী একজন ভ্যানচালক। একই গ্রামে থাকেন। দিলরুবার তৃতীয় এই বিয়ের আয়োজন করেছেন তার পরিবার এবং গ্রামের প্রভাবশালী লোকজন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন তিনি আবার বিয়ে করেছেন? তখন তিনি এবং তার পরিবার জানায় স্থানীয় লোকজন তাকে হয়রানি করছিলেন। দিলরুবা একত্রিশ বছর বয়সী নারী হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা-মা মনে করেছেন, তার সুরক্ষার জন্যই তাকে বিয়ে দেওয়া দরকার। দিলরুবাও রাজি হয়েছেন। কিন্তু এই বিয়েতেও দিলরুবা অসুখী। দিলরুবার মা জানান বর্তমান স্বামী রিমন বিয়েটি করেছেন শখের বশে। জালিয়াতি করে দিলরুবার সম্মতি নেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল রিমনের প্রথম বিয়ে ভেঙে গেছে। দিলরুবা দ্বিতীয় স্ত্রী। রিমনের প্রথম স্ত্রী (যাকে ভাবা হয়েছিল একেবারেই চলে গেছে) দিলরুবার বিয়ের পরদিন এসে হাজির হন। প্রথম স্ত্রী আসার পর থেকেই রিমন প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে একই কক্ষে বসবাস করছেন। দিলরুবা জানান প্রতিনিয়ত তাকে উপেক্ষা করা হয়। তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে তাকে রাখা হয়। সেই কক্ষে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ।

কাবিননামার ২১ নম্বর ধারায় রিমন উল্লেখ করেছেন তার আর কোনো স্ত্রী নেই (আইনি ভাষ্য ৬ দেখুন)। এছাড়াও রিমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দিলরুবাকে তিনি সাত কাঠা জমি (সাত হাজার দুইশ স্কয়ার ফুট) দেবেন (যদিও তা বিয়ের দলিলে উল্লেখ নেই)। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি।

আইনি ভাষ্য ৬

কাবিননামায় সাধারণত আগের বিয়েসংক্রান্ত তথ্যাদি থাকে। আগের বিয়ের অবস্থাও উল্লেখ করা থাকে। দিলরুবার ক্ষেত্রে, তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী দিলরুবার বিয়ের পরদিন ফিরে এসেছেন। কথিত সেই আগের বিয়ের ব্যাপারে প্রতারণার দায়ে দিলরুবার সম্মতি না নেওয়ায় তা চ্যালেঞ্জ করা যায়। যদিও একটি সমস্যা রয়েছে। মুসলিম আইনে যদি সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে কোনো বিয়েকে অবৈধ বা খারিজ ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

বিআইজিডি ও ব্লাস্টের ফলোআপ সাক্ষাৎকারের পর রিমন দিলরুবাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য দিলরুবাকে ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের কিছু লোক মনে করেন দিলরুবার উচিত তালাক দেওয়া এবং অসুখী বিয়ে ত্যাগ করতে বিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করে নিজের মর্যাদা রক্ষা করা। কিন্তু দিলরুবার মা এর বিরুদ্ধে।

দিলরুবা এখন রিমনকে তালাক দিতে চাচ্ছেন। তালাক দিয়ে তিনি দেনমোহরের এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করতে চান। কিন্তু রিমন মাত্র বিশ হাজার টাকা দিতে চান। দিলরুবা আবার ব্লাস্টের কাছে সহায়তা চেয়েছেন। ব্লাস্টের সহায়তায় যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ নম্বর ধারায় একটি মামলা চলছে।

উপসংহার

দিলরুবা তার স্বামীর অর্থনৈতিক শোষণ এবং তার সৎ ছেলে কর্তৃক যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যৌন নিপীড়নের বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত থেকে গেছে। মানুষ মনে করেছে তিনি আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন না, কারণ তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু দিলরুবা ও তার পরিবার আর্থিক সামর্থ্যের অভাবকে কোনো বাধা মনে করেনি। তারা মামলা দায়ের করতে ব্লাস্টের কাছে যান। এক্ষেত্রে প্রথম জ্যেষ্ঠ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের ইতিবাচক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞ বিচারক জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিতে মধ্যস্থতার জন্য মামলাটি পাঠিয়ে দেন। কারণ দুই পক্ষই তালাক চাইছিলেন। এর ফলে দ্রুততার সঙ্গে দেনমোহরের বিষয়টির সমাধান হয়। যদিও দিলরুবার বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বেশি টাকার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দিলরুবা তার প্রাপ্য টাকার অর্ধেকেই সমঝোতা করেন। ফলোআপ পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় দিলরুবা আবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, নারীর একা থাকা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও একা থাকতে চাইলে যৌন সহিংসতাসহ কিছু ঝুঁকি থাকে। কিন্তু বর্তমান বিয়েতেও দিলরুবা তার স্বামীর সঙ্গে সুখী নন। তাই তিনি তালাকের কথা ভাবছেন।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

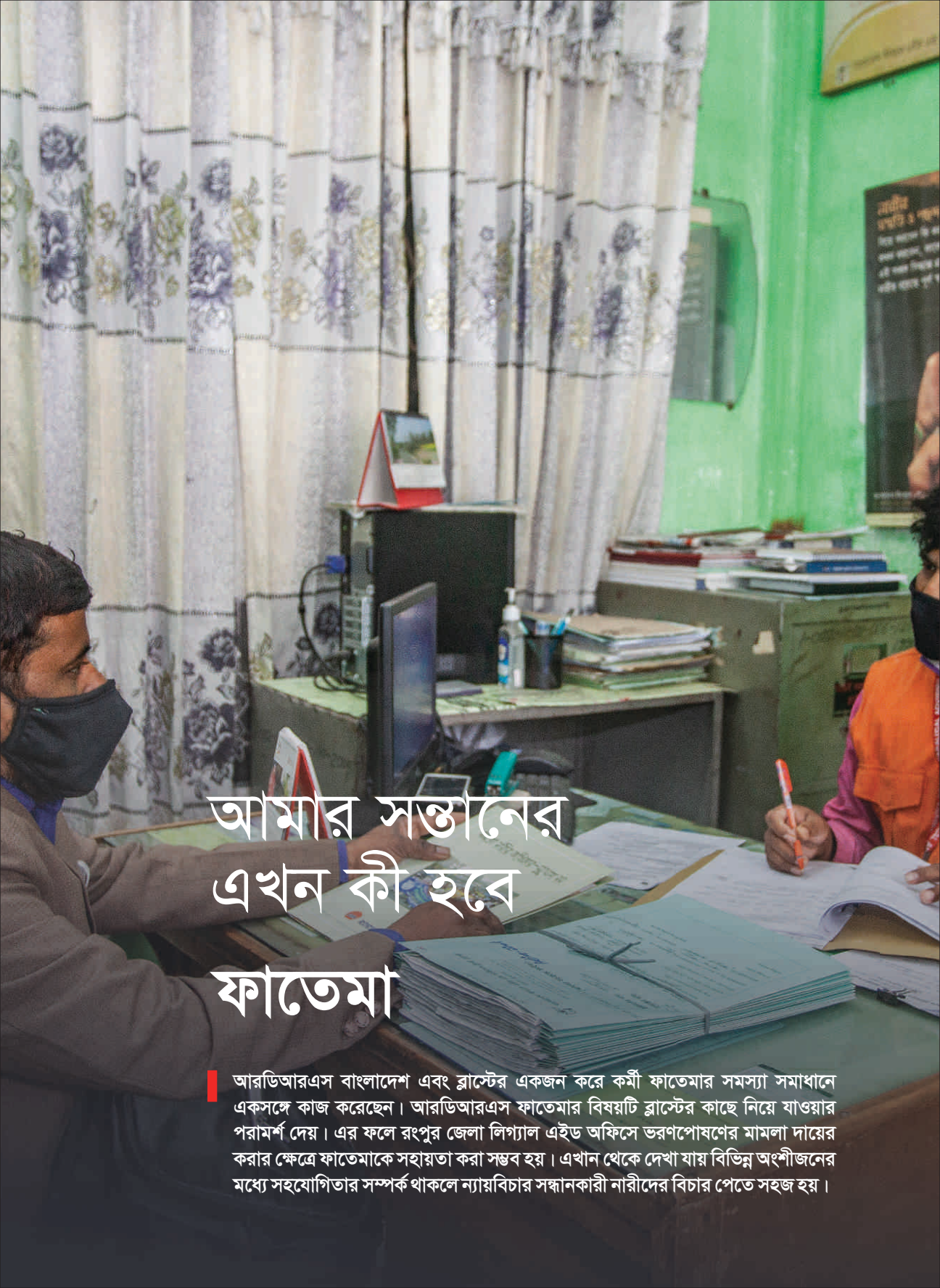

আমার সন্তানের এখন কী হবে

ফাতেমা

আরডিআরএস বাংলাদেশ এবং ব্লাস্টের একজন করে কর্মী ফাতেমার সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে কাজ করেছেন। আরডিআরএস ফাতেমার বিষয়টি ব্লাস্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এর ফলে রংপুর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে ফাতেমাকে সহায়তা করা সম্ভব হয়। এখান থেকে দেখা যায় বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকলে ন্যায়বিচার সন্ধানকারী নারীদের বিচার পেতে সহজ হয়।

গ. আমার সন্তানের এখন কী হবে —ফাতেমা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

যৌতুক, শ্বশুর কর্তৃক যৌন নির্যাতন, বহুবিবাহ, অভিবাসী শ্রমিক, খালি স্ট্যাম্প পেপার, যৌতুক নিরোধ আইন, ভরণপোষণের জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন, ব্লাস্ট, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, আরডিআরএস বাংলাদেশ, সালিশ, প্যারালিগ্যাল

ভূমিকা

ফাতেমার বয়স চব্বিশ। রংপুরের কাউনিয়ায় এক দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। ঢাকায় আসার পর তার বিবাহিত জীবনে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করেন। তার শ্বশুরও তাকে যৌন নিপীড়ন করেন। ঢাকা ও ঘোড়াশালের বিভিন্ন কারখানায় তিনি কাজ করেছেন। তিনি তার পরিবার ও শ্বশুরবাড়ি উভয় দিকেই উপার্জনকারী ব্যক্তি। বিয়ে টিকিয়ে রাখা এবং সহিংসতা বন্ধে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ন্যায়বিচার পাননি। যৌতুক নিরোধ আইনে একটি এবং ভরণপোষণের জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের আওতায় আরেকটি মামলা চলমান রয়েছে। আরডিআরএস বাংলাদেশ ও ব্লাস্ট এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা দিচ্ছে।

বৃত্তান্ত

ফাতেমা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু বাবার আর্থিক দুরবস্থার কারণে আর লেখাপড়া করতে পারেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি কাজ করছেন। বিয়ের আগে ফাতেমা তার বাবাকে কৃষিকাজে সহায়তা করতেন। বিয়ের পর তিনি একটি তামাক কারখানায় কাজ করেছেন। ফাতেমার বাবা ছিলেন একজন রিকশাচালক। পরে তিনি চাষাবাদের কাজ শুরু করেন, বর্তমানে বেকার। তার মা বাড়ির কাছেই একটি তামাক কারখানায় কাজ করেন। ফাতেমারা পাঁচ বোন। তাদের মধ্যে দুইজন গাজীপুরে কাজ করেন।

রুবেল ফাতেমার সাবেক স্বামী, বয়স তেইশ বছর। তিন ভাইবোনের মধ্যে রুবেলই সবার বড়। তিনি কখনোই স্কুলে যাননি। তার বাবা-মা গাজীপুরে কাজ করেন। তাদের মূল বাড়ি রংপুরের বীরবাগ। ফাতেমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং দুই দেবর একই বাড়িতে থাকেন। ফাতেমার শ্বশুর মাদকসেবী এবং সহিংস আচরণের মানুষ। তিনি প্রায়ই ফাতেমার শাশুড়ি ও রুবেলকে মারধর করতেন। অনেক সময় ফাতেমার শ্বশুর তার শাশুড়িকে জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত মারধর করতেন। তখন ফাতেমা তার শাশুড়িকে উদ্ধার করে নিজের কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখতেন, যেন তার শ্বশুর আর মারধর করতে না পারেন।

কেস

ফাতেমার বাবা ও শ্বশুরের মধ্যে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। একজন ঘটকের মাধ্যমে ফাতেমার শ্বশুর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিয়ের পাত্রী হিসেবে ফাতেমাকে দেখতে যান। আগে থেকে কোনো কিছু না জানিয়ে ফাতেমাকে পরদিন কাজ থেকে বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে দেন। ফাতেমা জানান, তাকে বিয়ে দিতে তার বাবা-মা চাপের মধ্যে ছিলেন। যেহেতু ফাতেমা ও তার ভাইবোনেরা বাড়ির বাইরে কাজ করতেন, তাই প্রতিবেশীরা তাদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলবেন—এমন ভয় ও চাপ ছিল। ফাতেমা বিয়েতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু কেউ তার কথা শোনেননি।

বিয়ের কাবিননামা অনুযায়ী ২০১৬ সালে বিয়ের সময় ফাতেমার বয়স ছিল উনিশ বছর। তবে ফাতেমার দাবি, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর। যদি তার বয়স ষোলো হয়ে থাকে, তাহলে তার বাবা-মা তার পক্ষ থেকে সম্মতি দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু যদি তার বয়স উনিশ হয়ে থাকে, যা বিয়ের কাবিননামায় উল্লেখ করা হয়েছে (আইনি ভাষ্য ৭ দেখুন); সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ফাতেমা বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখেন এবং চাইলে সম্মতি না-ও দিতে পারতেন। কিন্তু বাবা-মার কথা না মানা ছাড়া ফাতেমার টিকে থাকার আর কোনো সত্যিকারের উপায় ছিল না (যেমন: আর্থিক সামর্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদি)।

আইনি ভাষ্য ৭

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে যিনি বিয়ের নিবন্ধন করেছেন, সেই কাজী আসল বয়স জেনে থাকলে তাকে দায়ী করা যাবে। সেক্ষেত্রে কাজীর দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড (ছয় মাসের কম নয়) অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডও হতে পারে। এছাড়াও কাজীকে তিন মাসের কারাদণ্ড এবং জরিমানা না দিলে তার লাইসেন্স বাতিল হতে পারে (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ১১ নম্বর ধারা)। তবে মেয়ের প্রকৃত বয়স জানতেন না বলে কাজীরা সাধারণত দায় এড়ান। তারা বলেন, মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে পরিবার সকল কাগজপত্র দিয়েছে। বর-কনের বয়স উল্লেখ করার কোনো বিধান কাবিননামায় নেই। যদি কাবিননামায় বলা থাকে যে বর-কনে প্রাপ্তবয়স্ক, তাহলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কাজীকে দায়ী করার কোনো সুযোগ নেই।

বিয়ের সময় ফাতেমার শ্বশুরবাড়ি থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা যৌতুক চাওয়া হয়। কিন্তু ফাতেমার বাবা-মা মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা দিতে পেরেছিলেন। এই টাকাও তারা গরু বিক্রি করে জোগাড় করেছিলেন। টাকার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে ফাতেমাকে মৌখিকভাবে চাপ দেওয়া হতে থাকে। এমনকি হুমকি দেওয়া হয় যে বাকি টাকা পরিশোধ না করলে ফাতেমাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফাতেমার পরিবার আরও ষাট হাজার টাকার অয়োজন করে। এজন্য ফাতেমার মা এবং বোন ব্র্যাক থেকে আলাদা আলাদা নামে ত্রিশ হাজার করে ষাট হাজার টাকা ঋণ নেন। ক্রমাগত চাপের মুখে ফাতেমার মা আরও বিশ হাজার টাকা দেন। এছাড়াও তিনি তার মেয়ের সংসারের জন্য খাট এবং আসবাবপত্র কিনে আনেন। ফাতেমার পরিবার যৌতুকের পুরো টাকা দেওয়ার পরও তার শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে।

যেহেতু ফাতেমা তার বাবা-মার বাড়ি থেকে আর টাকা আনতে পারেননি, তাই তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে চাকরি করার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু চাকরি এবং সংসার একসঙ্গে সামলানো নিয়ে ফাতেমা চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি চাকরি করতে রাজি হননি। এর ফলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ক্ষিপ্ত হন। তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি ফাতেমার বাবা-মাকে ডেকে এনে তাকে নিয়ে যেতে বলেন। অজুহাত হিসেবে বলা হয়—ফাতেমা তাদের কথা মেনে চলেন না। তারা জানান, ফাতেমা যদি গাজীপুরে ফিরে আসতে চান, তাহলে বাড়তি আরও ষাট হাজার টাকা নিয়ে আসতে হবে।

ফাতেমা যখন গ্রামে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন, তখন তিনি গর্ভবতী হন। এই সংবাদ তার শ্বশুরবাড়িতে জানানো হলেও তারা তাকে আসতে অনুমতি দেননি। কয়েকদিন পর ফাতেমার শ্বশুর-শাশুড়ি তার গ্রামে আসেন। যৌতুকের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে তার শ্বশুর-শাশুড়ি

একটি অনানুষ্ঠানিক সালিশ ডাকেন। এর মাধ্যমে ফাতেমা শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন কি-না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছাতে পারেননি। তখন ফাতেমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের নিজ গ্রাম রংপুরের হাজারপারে আরেকটি সালিশ ডাকার দাবি জানান। দুই পরিবার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং রুবেলের গ্রামের প্রতিবেশীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সালিশের সময় রুবেল ফাতেমার মায়ের কাছ থেকে তার মা যেসব জিনিসপত্র নিয়েছেন, সেগুলো ফিরিয়ে দিতে বলেন (যেমন খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র)। ফাতেমার শাশুড়ি তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধূর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিজের মতামত দিয়েছিলেন। তবে ফাতেমাকে ফিরিয়ে না নেওয়ার ব্যাপারে রুবেল অনড় ছিলেন। ফাতেমার শ্বশুরও তাকে ফিরিয়ে নিতে চাননি। একপর্যায়ে রুবেলের বাবা ফাতেমার বাবাকে থাপ্পড় মারেন। বিষয়টি ফাতেমাকে গভীরভাবে আহত করলেও তিনি কিছুই বলতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার কিছু করার ক্ষমতা নেই।

সালিশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ফাতেমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে তার বাবা-মায়ের বাড়িতে রেখে যান। এর পরে ফাতেমার পরিবার আবারও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হিসেবে নিজেদের বাড়িতে আরেকটি সালিশ ডাকেন। সেখানে দুই পক্ষই উপস্থিত ছিলেন। সালিশে ফাতেমার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আরও যৌতুক দাবি করা হয়। ফাতেমার পরিবার আবারও তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর থেকে ফাতেমা গর্ভকালীন পুরো সময় বাবা-মায়ের বাড়িতেই থাকেন। সেখানে তার একটি কন্যাশিশু জন্ম নেয়। সন্তান হওয়ার সময় রুবেল বা তার বাবা-মা কেউ আসেননি। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার জন্য ফাতেমার পরিবারের দশ হাজার টাকা খরচ হয়। তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়নি।

বাড়িতে বসে থেকে কোনো লাভ নেই, জীবন চালিয়ে নিতে হবে ভেবে মেয়ের জন্মের তিন মাস পর ফাতেমা চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নেন। ঘোড়াশালে তার ছোট বোন একটি কারখানায় কাজ করতেন। ফাতেমা সেখানেই তার বোনের কাছে চলে যান। তারা দুজনই একটি বিস্কুট ও চিপস তৈরির কারখানায় চাকুরি শুরু করেন। কিছুদিন পর ফাতেমার বড় বোন তাকে নিজের কর্মস্থল গাজীপুরে নিয়ে আসেন। এখানে ফাতেমাকে তার বড় বোন একটি সোয়েটার কারখানায় চাকরি পাইয়ে দেন। সমঝোতার আশায় ফাতেমার বোনেরা তাদের বাড়িতে আরেকটি সালিশ ডাকেন। এটি ছিল চতুর্থ সালিশ। ফাতেমার দেবর এই সালিশ পরিচালনা করেন। রুবেল এই সালিশেও আসেননি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল রুবেল ফাতেমার সঙ্গে সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী নন। তবে সালিশে ফাতেমার শাশুড়ি তাদের পরিবারের আচরণের জন্য ক্ষমা চান এবং ফাতেমাকে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

ফাতেমার বোন ও বাবা-মা তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে রাজি হন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি ফিরে ফাতেমা দেখতে পান রুবেল আরেকটি বিয়ে করেছেন। ফাতেমার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই এই মেয়ের সঙ্গে রুবেলের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের বিষয়টি রুবেল ও তার পরিবার ফাতেমার কাছে গোপন

রেখেছিল। বিয়ের আগে তিনি ফাতেমাকে কোনো নোটিশ পাঠাননি, যদিও আইনত তা করা বাধ্যতামূলক। ফাতেমার শাশুড়ি তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কারণ দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। রুবেলের দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতেমাকে ফিরে আসতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ফাতেমা শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুবেল ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। রুবেল আবার ফাতেমাকে তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। ফাতেমা নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি নিজের নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখতে পান না।

তবে ছয় মাস পর, রুবেলের দ্বিতীয় স্ত্রী তার বাবার বাড়ি গিয়ে রুবেলকে তালাকের নোটিশ পাঠিয়ে দেন। তালাকনামা গ্রহণের পর রুবেল ফাতেমাদের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এরপর ফাতেমা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এমনও সময় গেছে যে রুবেল কোনো খাবারও দিতেন না ফাতেমাকে। তার মা খাওয়ার আয়োজন করে না দিলে ফাতেমাকে অনাহারে দিন কাটাতে হতো। ফাতেমার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে। এবার তার সিজারের প্রয়োজন পড়ে। প্রসব ও হাসপাতালের কোনো খরচই রুবেল দেননি। যাবতীয় খরচ ফাতেমার মা পরিশোধ করেন। ফাতেমার শ্বশুর পরামর্শ দেন ফাতেমা যেন বাবার বাড়ি চলে যায়। অবশ্য তিনি আশ্বস্ত করেন যে নাতির ভরণপোষণের খরচ বহন করবেন। ফাতেমা সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকা শুরু করেন। কিছুদিন পর তার ছেলের নিউমোনিয়া হয়। তখন পাঁচটি ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। সবগুলো ইনজেকশনের জন্য মোট খরচ পড়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা। যাতায়াত ও অন্যান্য ওষুধ বাবদ খরচ আরও বাড়ে। কিন্তু ফাতেমার শ্বশুরবাড়ি কোনো খরচই বহন করেনি।

পাঁচ মাস পার হওয়ার পর ফাতেমা ও তার বাবা রুবেল ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাগর নামে ফাতেমাদের এক আত্মীয় সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সাগর তখন ফাতেমার স্বামীকে ফোন করে ফাতেমাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তখন ফাতেমা ও তার বাবাকে নিয়ে সাগর কল্যাণ মেট্রো থানায় অভিযোগ করতে যান। কিন্তু পুলিশ পরামর্শ দেয় তারা যেন কাউনিয়া থানায় যান, যেহেতু রুবেল সেই এলাকায় থাকেন। তবে সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে সাগর ফাতেমাকে কাচারি বাজারে অবস্থিত ব্লাস্টের অফিসে নিয়ে যান। ব্লাস্ট ফাতেমার আবেদন গ্রহণ করে মধ্যস্থতার জন্য রুবেলকে দুটি নোটিশ পাঠায়।

রুবেল জানতে পারেন তৃতীয় নোটিশের পর তিনি যদি হাজির না হন, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। এটা শোনার পর তিনি ফাতেমার বোনের বাড়িতে আসেন। রুবেল ফাতেমার বোনের সঙ্গে দেনদরবার করে আবেদন উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ফাতেমার বোন জানান, রুবেল ফাতেমাকে ফিরিয়ে নিলে অভিযোগ উঠিয়ে নেওয়া হবে। রুবেল রাজি হন। দুই পক্ষই সালিশের মাধ্যমে সমঝোতার আরেকটি চেষ্টা করতে রাজি হন। এটি ছিল পঞ্চম ও শেষ সালিশ। ফাতেমার গ্রামে এই সালিশ বসেছিল। ফকির নামে সরকারদলীয় একজন স্থানীয় নেতার নেতৃত্বে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ফাতেমার পরিবারকে অনুরোধ করেন সংসার টিকিয়ে

রাখতে যেন শেষবারের মতো ফাতেমাকে তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আরেকটি সুযোগ দেন। ফাতেমাকে ফিরিয়ে নিতে রুবেল রাজি হন। ফাতেমার দেবর স্ট্যাম্প কাগজে রুবেল ও তার বাবার স্বাক্ষর নেন এই মর্মে যে, টাকার জন্য তারা আর ফাতেমাকে নির্যাতন করবেন না। ফাতেমা ও তার ছেলেকে গাজীপুরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর তিনি ব্লাস্টে করা আইনি অভিযোগ তুলে নেন।

ঢাকায় ফিরে আসার পর, ফাতেমা একটি পোশাক কারখানায় চাকুরি শুরু করেন। তিনি তার ছেলেকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে কাজ করতে যেতেন। নিজের আয়ের ওপর ফাতেমার কোনো অধিকার ছিল না, তার আয়ের একটা বড় অংশ তাকে শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে দিতে হতো। তার শ্বশুর-শাশুড়ি যেহেতু তার ছেলের দেখাশোনা করতেন, তাই ফাতেমা তাদের মাসে আড়াই হাজার করে টাকা দিতেন।

তবে যে কারখানায় ফাতেমা চাকুরি করতেন, করোনার সময় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার কোনো আয়রোজগার ছিল না। ফাতেমা ছয় দিন প্রায় অনাহারে থাকার পর তার মায়ের কাছে এক হাজার এবং বোনের কাছে পাঁচশ টাকা ধার চান। এক হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি ফ্লাস্ক এবং বাকি টাকা দিয়ে সিগারেট, পান ও চিনি কেনেন। রুবেল তখন চা-সিগারেট বিক্রি করা শুরু করেন। সেই আয় দিয়ে তারা কোনোমতে টিকে ছিলেন। তার শ্বশুর আবারও সেই রোজগার থেকে ভাগ চান। ফাতেমা রোজগারের টাকা দুই ভাগ করে বেশিরভাগ তার শ্বশুরবাড়িতে দিতেন—কারণ সেই পরিবারে সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল।

তারপরও ফাতেমার ওপর তার শ্বশুরের নির্যাতন বন্ধ হয়নি। ফাতেমাকে তার শ্বশুর গালিগালাজ করতেন। তাকে 'শুয়োরের বাচ্চা! তুই টাকা আনছ না কেন? খানকির বেটি, তুই টাকা আনছ না কেন?' ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতেন। রুবেল যদি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন, তাহলে তাকেও তার বাবা মারধর করতেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ফাতেমার দীর্ঘমেয়াদি মাথাব্যথা শুরু হয়, কারণ তার শ্বশুর ক্রমাগত তাকে চড়-থাপ্পড় মারতেন। এছাড়াও ফাতেমার শ্বশুর তাকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করেন। ফাতেমার সঙ্গে তিনি যৌনমিলনের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ফাতেমা এড়িয়ে যেতেন। যখনই ফাতেমার শ্বশুর বাসায় একা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন, তখনই ফাতেমা তার ছেলেকে নিয়ে বাইরে চলে যেতেন। যখন রুবেল বাইরে থাকতেন, তখন ফাতেমার শ্বশুর তার কক্ষে গিয়ে তাকে ডাকতেন। কিন্তু ফাতেমা ঘুমের ভান ধরে থাকতেন। এসব ব্যাপারে ফাতেমা কখনো রুবেলকে কিছু বলেননি কারণ তিনি জানতেন রুবেল এসব কথা বিশ্বাস করবেন না। একপর্যায়ে ফাতেমার শ্বশুর সিগারেট দিয়ে তার হাত পুড়িয়ে দেন এবং পায়ে আঘাত করেন।

যেহেতু ফাতেমার শ্বশুর মাদকসেবী ছিলেন এবং তার জুয়া খেলার অভ্যাস ছিলো, তাই তিনি সবসময় ফাতেমাকে টাকার জন্য চাপ দিতেন। ফাতেমার শাশুড়িও নিজের স্বামীর আচরণের জন্য ফাতেমাকেই কটাক্ষ করতেন। ফাতেমাকে বলতেন, "তোর শ্বশুরকে বিয়ে করে তার সঙ্গে

ঘুমা।" শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ে রুবেল ও ফাতেমা আলাদা থাকা শুরু করেন। তবে ফাতেমার শ্বশুরের অত্যাচার বন্ধ হয়নি। এসব পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে ফাতেমা খুব বেশিকিছু তার বাবা-মাকে জানাননি। একপর্যায়ে মারধর করে ফাতেমার শ্বশুর তার পা ভেঙে দেন। ফাতেমা শেষ পর্যন্ত তার মাকে নির্যাতনের কথা জানান। কিন্তু এসব প্রচণ্ড সহিংসতার ব্যাপারে তার মা কিছুই করতে পারেননি। এই ঘটনার পর ফাতেমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে আবারও বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রুবেল বাসস্ট্যান্ডে এসে ফাতেমাকে বাসে তুলে দিয়ে যান এবং প্রতিশ্রুতি দেন কিছুদিনের মধ্যে তাকে নিয়ে আসবেন। তবে আঠারো দিন পর রুবেল ফাতেমার কাছে তালাকনামা পাঠিয়ে দেন।

তালাকনামা পাওয়ার পর ফাতেমা স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি সাহায্যের জন্য ১০৯ সরকারি হেল্পলাইনে কল করেন। এছাড়াও তিনি ফরিদ নামে একজন পারিবারিক বন্ধুর কাছে যান। ফরিদ ছিলেন গ্রাম পুলিশ। ফরিদ তাকে আরডিআরএস বাংলাদেশ-এ কর্মরত পারভিন নামে একজন কমিউনিটি অ্যানিমেটর তথা আরজে সহায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বেশ কয়েকভাবে পারভিন ফাতেমাকে সাহায্য করেন। পারভিন নিজের টাকায় ফাতেমার কাগজপত্র ফটোকপি করে আরডিআরএসের একজন কর্মকর্তাকে সেগুলো দেখার জন্য দেন। আরডিআরএসের কর্মকর্তা ফাতেমাকে পরামর্শ দেন তিনি যেন পোশাক কারখানায় চাকুরি শুরু করেন। কারণ তার যদি স্থায়ী আয়রোজগার থাকে, তাহলে তার স্বামী তার কাছে আবারও ফিরে আসবেন। এছাড়াও ফাতেমা তখন মামলার খরচ জোগাতে পারবেন, যেহেতু আইনি প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল। এসব পরামর্শ ফাতেমার পছন্দ হয়। কিন্তু তিনি চিন্তিত ছিলেন যদি বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সেজন্য সংসার টিকে থাকবে এমন পথই তিনি অনুসরণ করেন।

পারভিনের সহায়তায় ফাতেমা প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্যের কাছে যান। সেই সদস্য ফাতেমাকে পরামর্শ দেন তিনি যেন দেনমোহরের টাকা আদায় করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেন। এই পরামর্শে ফাতেমা রাজি না হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পলাশের কাছে যান। তিনি ভেবেছিলেন সালিশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করলে ভালো হবে। তালাকনামা দেখে চেয়ারম্যান ফাতেমাকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সবার পরামর্শে ফাতেমা নিজ গ্রামের একজন কেরানির কাছে গেলে সেই কেরানি তাকে অ্যাডভোকেট মাসুদের ফোন নম্বর দেন। ফাতেমা মামলা পরিচালনার জন্য অ্যাডভোকেট মাসুদকে তিন হাজার টাকা ফি দেন। ফাতেমা জানান এই টাকা জোগাড় করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ নম্বর ধারায় অ্যাডভোকেট মাসুদ একটি মামলা দায়ের করেন এবং রুবেল ও তার পরিবারকে মধ্যস্থতার জন্য নোটিশ পাঠান। মাননীয় আদালতে প্রথম শুনানি হয় ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। রুবেল আদালতে যাননি, কিন্তু রুবেলের বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন। ফলে রুবেলের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। আদালতে মামলার প্রতি ধার্য দিবসের জন্য অ্যাডভোকেট মাসুদ দুই হাজার টাকা করে ফি ঠিক করেন। ফাতেমার জন্য এই ফি অনেক ব্যয়বহুল ছিল। ফাতেমা ও তার পরিবার

ভেবেছিল অ্যাডভোকেট মাসুদ রুবেলের পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেবেন সেজন্য মামলায় খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। গবেষক দল অ্যাডভোকেট মাসুদের সাক্ষাৎকার নিতে পারেননি।

মামলা চালানোর খরচের কথা চিন্তা করে আরডিআরএস ফাতেমাকে পরামর্শ দেয়—তিনি যেন মামলাটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠিয়ে দেন। আরডিআরএস ফাতেমাকে সহায়তা করতে ব্লাস্টের একজন প্যারালিগ্যালকে নিযুক্ত করে দেয়—যাতে ফাতেমা রংপুর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ভরণপোষণের একটি মামলা দায়ের করতে পারেন (আইনি ভাষ্য ৮ দেখুন)। ২০২১ সালের ৯ মার্চ ফাতেমা দ্বিতীয়বারের মতো উক্ত অফিসে যান। তাকে সহায়তা করার জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে অ্যাডভোকেট নাসিরকে নিযুক্ত করা হয়। ২০২১ সালে করোনা অতিমারিকালে লকডাউনের কারণে ওই অফিসে যেতে ফাতেমার দেরি হয়। বর্তমানে ফাতেমার ভরণপোষণের মামলাটি দেখভাল করছেন অ্যাডভোকেট নাসির। ফাতেমা এখন পরিকল্পনা করছেন আরডিআরএস বাংলাদেশ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার। সেখান থেকে তিনি কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিকল্প জীবিকায়নের চেষ্টা করবেন।

আইনি ভাষ্য ৮

সন্তানের ভরণপোষণের মামলার জন্য প্রমাণ হিসেবে ফাতেমার স্বামীর জাতীয় পরিচয়পত্র দরকার, কিন্তু ফাতেমার স্বামী তা দিচ্ছেন না। এর ফলে ভরণপোষণ আদায় করতে বিকল্প পদ্ধতি হলো সন্তানের জন্মসনদ। কিন্তু তা-ও ফাতেমার কাছে নেই। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফাতেমার সন্তানের জন্মসনদ জোগাড় করতে আরডিআরএসের কমিউনিটি অ্যানিমেটর সহায়তা করছেন। তবে বাবা-মায়ের পরিচয় প্রমাণ করার বিকল্প পদ্ধতিও আছে। যেমন হাসপাতাল থেকে জন্মসনদ জোগাড় করা (২০০৪ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনের ৪ নম্বর ধারায় যেসব সরকারি কর্তৃপক্ষ জন্ম নিবন্ধন করতে পারে এবং জন্মসনদ দিতে পারে, তার একটি তালিকা আছে)। হাসপাতাল থেকে জন্মসনদ জোগাড় করে এখন ফাতেমাকে আদালতে জমা দিতে হবে (১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১১২ নম্বর ধারা)।

ফাতেমার শেষ আশ্রয়স্থল ছিল আইন। কিন্তু ধীরগতির ও ব্যয়বহুল আইনি প্রক্রিয়ার কারণে ফাতেমার আর কোনো আশা ছিল না। তিনি মনে করেন তার সব চেষ্টা বিফলে গেছে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফাতেমা বলেন, "আমার বাবা-মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। এই সন্তান নিয়ে আমি কোথায় যাব? আমি কী আর বলব আপা, এ সবই আমার কপালে ছিল।"

উপসংহার

ফাতেমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে হয়। কোনো কিছু বোঝার আগেই তাকে রংপুর থেকে ঢাকায় আসতে হয়েছিল। ফাতেমার ঘটনা থেকে দেখা যায়, নিরাপত্তা ও মঙ্গলের কথা উপেক্ষা করে বিয়ে টিকিয়ে রাখতে ফাতেমার অন্তহীন চেষ্টা ছিল। তিনি তার পরিবারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে

নিজে আয়রোজগার শুরু করেছেন। কিন্তু যখন কোনো কিছুই কাজ করেনি, তখন তার শ্বশুরের যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচতে স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকা শুরু করেছেন। নিজের সংসার টিকিয়ে রাখতে তিনি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েও মেনে নিয়েছেন। যখন কোনো কিছুই কাজে লাগেনি, তখন তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে গেছেন এবং বেশকিছু সালিশ করেছেন। কিন্তু কেউ তার মঙ্গল ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেননি। বর্তমানে তিনি দুটি মামলা লড়ছেন। একটি মামলায় সহায়তা করছে আরডিআরএস বাংলাদেশ এবং ব্লাস্ট। কিন্তু সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারে ফাতেমার খুব একটা আস্থা নেই।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

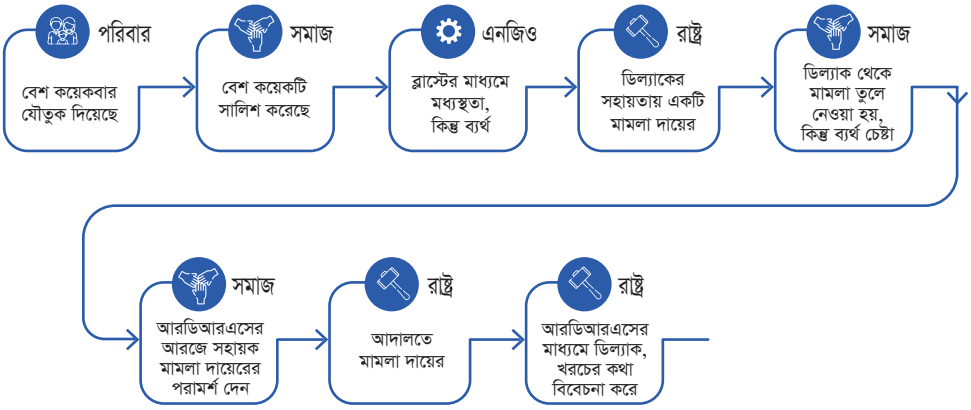

আমার গড়া ঘরে আমারই কোনো অধিকার নেই

রিনা

আরডিআরএসের একজন কমিউনিটি অ্যানিমেটর তথা আরজে সহায়ক সামাজিক সালিশে কথা বলছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল রিনার সমস্যার সমাধান করা।

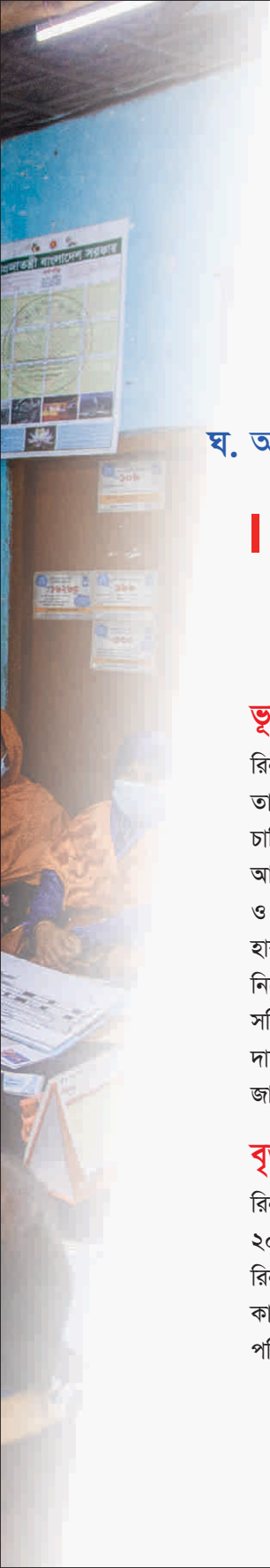

ঘ. আমার গড়া ঘরে আমারই কোনো অধিকার নেই –রিনা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ, বহুবিবাহ, পুনর্বাসন, আরডিআরএস বাংলাদেশ, সামাজিক সালিশ, আদালত, পারিবারিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ আইন ২০১৩, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

ভূমিকা

রিনা রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার পঁচিশ বছর বয়সী একজন নারী। ২০০৯ সালে রহিমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার ওপর শারীরিক সহিংসতা চালিয়েছেন। অবস্থা এতই গুরুতর ছিল যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যখন তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করেন, তখন রিনা মানসিক সহিংসতা ও অর্থনৈতিক হয়রানির শিকার হন। রিনা ও তার বাবাকে বাড়ি তৈরি করে দিতে বলা হয়, কিন্তু রিনা পরবর্তীতে সেই বাড়িরও অধিকার হারান। রহিমের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায় যখন রিনার বাবা ও শ্বশুরের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। রিনা ও তার বাবা মধ্যস্থতা এবং সমঝোতার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সহিংসতা বন্ধ হয়নি। এরপর রিনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি যৌতুকের মামলা দায়ের করেন। রহিমকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মাননীয় আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জামিনে মুক্ত হয়ে রহিম রিনাকে তালাকের নোটিশ পাঠান।

বৃত্তান্ত

রিনা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর আর পড়াশোনা করতে পারেননি কারণ ২০০৯ সালে ষোলো বছর বয়সে তাকে রহিমের সঙ্গে তার বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দেন। রহিম ও রিনা একই গ্রামের। রিনার ফুপার দিকের আত্মীয় রহিম। রহিমের বয়স একত্রিশ বছর। ঢাকার কারওয়ান বাজারে একটি ডিমের ব্যবসার ভ্যানচালক হিসেবে তিনি কাজ করেন। রহিম ও তার পরিবার কাজের জন্য ঢাকায় চলে এসেছেন। মাঝেমধ্যে তারা গ্রামে যান। তারা সবাই একসঙ্গেই

থাকেন। সেজন্য বিয়ের পর রিনাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তাদের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বড় মেয়ের বয়স নয় বছর আর ছোট মেয়ের সাত বছর।

কেস

বিয়ের পর রিনার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকায় ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সাত বছর তিনি মোহাম্মদপুরে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। বিয়ের দুবছর পর রহিমের কাজের কারণে রিনা ও তাদের প্রথম সন্তান নিয়ে তারা বসিলায় নিজেদের আলাদা ভাড়া বাসায় গিয়ে ওঠেন। রিনার মতে, সংসার ভালোই চলছিল। স্বামীর আচরণে তিনি খুশিই ছিলেন। তার ও সন্তানের যত্ন নিতেন রহিম। রিনা যা চাইতেন তা-ই এনে দিতেন।

রহিম ও তার পরিবার অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে ঢাকায় জীবনযাপন করতেন। উপার্জিত অর্থ দিয়ে তারা কাশেমপুর গ্রামে জমি কিনেছেন। রিনার দ্বিতীয় মেয়ের যখন জন্ম নেয়, শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে বলা হয় রিনা যেন তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাশেমপুরের জমিতে বাড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। রিনাও চেয়েছিলেন তার নিজের একটি বাড়ি হবে, তাই তিনি রাজি হন। ২০১৭ সালে তিনি ঢাকা থেকে তার মেয়েদের নিয়ে ফিরে আসেন। এক বছর রিনা তার মায়ের সঙ্গে ছিলেন। ২০১৮ সালে রিনা ও তার বাবা বাড়ি বানানো শুরু করেন। বিয়ের সময় রিনার বাবা যৌতুক হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন টাকা নেননি। এরপর রিনার বাবা রিনার শ্বশুরের জমি বন্ধক নিয়ে গম চাষ করেন। রিনার বাবা যৌতুক হিসেবে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন সেই টাকা, গম বিক্রির টাকা এবং ঢাকায় থাকাকালীন রিনার যা সঞ্চয় হয়েছিল, সবকিছু দিয়ে রহিমের পরিবারের জন্য বাড়ি বানিয়ে দেন। বাড়ি বানাতে এক বছর লেগেছিল। এরপর রিনা সেই বাড়িতে তার দুই সন্তান নিয়ে বসবাস শুরু করেন। রহিম ও তার পরিবার ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। তারা একে অপরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতেন।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে, অর্থাৎ ঢাকা থেকে আসার আট মাস পর রিনা রহিমের আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেন। যখনই রহিম রিনা ও তার মেয়েদের দেখতে গ্রামে আসতেন, রিনাকে মারধর করতেন। তার মেজাজ হঠাৎ ভালো, হঠাৎ খারাপ হয়ে যেত। রিনা স্তম্ভিত হতেন এই আচরণ দেখে। কারণ এর আগে কখনোই রহিম বা তার শ্বশুর-শাশুড়ি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কানাঘুষা থেকে রিনা জানতে পারেন ঢাকায় রহিম আরেক নারীর সঙ্গে থাকেন, যাকে রহিম নিজের বোন বলে পরিচয় দেন। রিনার সন্দেহ সত্যি হয়। ঢাকায় কাজ করা রিনার এক ভাই জানান রহিম আরেকটি বিয়ে করেছেন। ২০১৯ সালে রিনা রহিমের মুখোমুখি হলে রহিম তা স্বীকার করেন। তবে রহিম আবার যখন বিয়ে করেন, রিনাকে কোনো নোটিশ পাঠাননি (আইনি ভাষ্য ৯ দেখুন)। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী নোটিশ পাওয়া রিনার আইনি অধিকার।

আইনি ভাষ্য ৯

একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষ আরেকজন নারীকে সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবেন না (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৬)। বিয়ে করতে চাওয়া স্বামী সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর একটি লিখিত আবেদন জমা দেবেন। এরপর ধার্য করা ফি পরিশোধ করে প্রস্তাবিত বিয়ের কারণ বর্ণনা করবেন। এছাড়াও তাকে আবেদনে বলতে হবে বর্তমান স্ত্রীর সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি-না [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৬ (২)]। চেয়ারম্যান তখন স্বামী ও স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। এরপর সালিশি পরিষদ গঠন করবেন [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৬(৩)]। বিয়ে যদি প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে সালিশি পরিষদ দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন দেবে এবং সে অনুযায়ী শর্তারোপ করবে। সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে, স্বামী তার বর্তমান স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করবেন [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৬ (৫)(ক)]। এছাড়াও তার এক বছরের কারাদণ্ড, অথবা সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড হতে পারে [মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৬ (৫)(খ)]। বাস্তবে অনেক এলাকায় সালিশি পরিষদ গঠন করা হয় না এবং এসব প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয় না।[৫] প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ হয়ে যায় না। স্বামী শুধু পরবর্তী বিয়ের জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু বিয়ে অবৈধ হয় না।

রহিমের বাবা-মা যখন তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানলেন, শুরুতে তারা রিনার পক্ষে ছিলেন। তারা ভেবেছিলেন রহিম কিছুটা মাদকাসক্ত। তাই সাময়িক উন্মাদনায় হয়তো দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকতে পারেন। তারা রহিমকে চব্বিশ দিনের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখেন। রহিমকে পুনর্বাসনে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা। কারণ রহিমের বাবা-মা জানতেন রহিম প্রায়ই ধূমপান করেন; তাই নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন। তবে রিনা বিশ্বাস করেছিলেন রহিমের বাবা-মা তাকে পুনর্বাসনে পাঠিয়েছেন যেন রহিম 'দ্বিতীয় স্ত্রীর আসক্তি' এবং তার 'জাদুটোনা' ও 'মোহ' থেকে মুক্তি পান। রহিমকে সেখানে পাঠানোর আগে, রিনার শ্বশুর তার অনুমতি নিয়েছেন। রিনাও রাজি হয়েছেন। রিনা নিজের গরু বিক্রি করে মাসে সাড়ে চার হাজার করে টাকা দিয়েছেন রহিমের চিকিৎসার জন্য। রহিমের পরিবার প্রতিশ্রুতি দেন, তারা রহিমকে তখনই পুনর্বাসন থেকে বের করে আনবেন—যদি রহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করে। পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বের হতে রহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে রিনার কাছে ফিরে যেতে রাজি হন। রহিম সাময়িকভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

---

[৫] সুরা আল বাকারা, আয়াত ২২৯, বিলকিস ফাতিমা বনাম নাজিম-উল-ইকরাম মামলার কথা ১১ ডিএলআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে (ডব্লিউ.পি.) (১৯৫৯) ৯৩।

দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর রহিম গ্রামে ফিরে আসেন। রিনার সঙ্গে তিনি দশ মাস থাকেন। রিনার মতে, তারা শান্তিতেই বসবাস করছিলেন। তবে একদিন সকালে রহিম হঠাৎ উধাও হয়ে যান। পরে রিনা জানতে পারেন রহিম ঢাকায় তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে চলে গেছেন। রিনা তখন ভাবলেন নিজের ভাগ্য মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। রহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। মাঝে মাঝে গ্রামে এসে রিনা ও তার মেয়েদের দেখে যান।

২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা অতিমারির কারণে প্রথম লকডাউনের সময় রহিম ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে আসেন। তখন রিনার মনে হয়েছে তার প্রতি রহিমের আচরণ যেমন ছিল তেমনই আছে, একটুও বদলায়নি বরং আরও খারাপ হয়েছে। রিনাকে তিনি প্রায়ই গালিগালাজ ও মারধর করতেন। রহিমের দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে রিনা ও রহিমের মধ্যে ঝগড়া চলতেই থাকে। দ্বিতীয় বিয়ের জন্য রহিম রিনাকে দায়ী করেন—কারণ রিনা তাকে একটি 'পুত্রসন্তান' দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়াও একাধিক বিয়েকে রহিম মনে করতেন 'পারিবারিক ঐতিহ্য'। যেহেতু তার বাবা ও চাচাদের একাধিক স্ত্রী আছে, তাই রহিম ভাবতেন তারও দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার রয়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে রহিম আবারও ঢাকায় চলে যান।

২০২০ সালের ১ আগস্ট ঈদ-উল-আজহার সময় রিনার শ্বশুর-শাশুড়ি গ্রামে আসেন। জমিসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে রিনার বাবা ও শ্বশুরের মধ্যে মারামারি হয়। রিনার শ্বশুর যে জমি তার বাবাকে বন্ধক দিয়েছিলেন, সেই জমি নিয়েই এই বিরোধ। মারামারির মাত্রা বেড়ে যায় যখন রিনার বাবা রিনার শ্বশুরের শার্টের কলার ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেন। রিনার শ্বশুর অপমানিত হয়ে রিনার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। রিনার শ্বশুর তখন রিনার বাবার আচরণের জন্য সালিশ ডাকতে চান। কিন্তু রিনার বাবা রাজি হননি। এরপর রিনার শ্বশুর-শাশুড়ি ঢাকায় চলে যান।

দুই সপ্তাহ পর, তারা আবার গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু এবার রহিমকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। আগের ঘটনা নিয়ে তখনও তারা রাগান্বিত ছিলেন। এক রাতে রহিমের সঙ্গে রিনার ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে রিনা রহিমের ফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেন—কারণ রহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। রহিম তখন রিনাকে মারধর শুরু করেন। রিনার মতে, আগে তার শ্বশুর-শাশুড়ি রিনার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এবার তারা তার বিরুদ্ধে চলে গেছেন। রহিমকে তারা বাধা দেন না। রিনা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। পরের দিন তাকে আবার মারধর করা হয়। রিনা বুঝতে পারছিলেন তার বাবার প্রতি রহিম ও তার পরিবারের যে ক্রোধ, তাকে মারধর করে তার প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। রিনাকে একটি কক্ষে আটকে রেখে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। রহিম তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন।

প্রতিবেশীরা রিনার চিৎকার শুনে তার বাবা-মাকে খবর দেন। রিনার বাবা-মা, খালা-চাচা এবং স্থানীয় আরও অনেকে রহিমের বাড়ি যান রিনাকে উদ্ধার করতে। রহিমের বাড়িতে গিয়ে রিনার বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে রহিমকে মারধর করেন। রিনার শ্বশুর তখন রিনার বাবার পায়ে আঘাত করেন। এর ফলে দুই পরিবারের মধ্যে নতুন করে আবার মারামারি শুরু হয়। এতে এমন এক বিশৃঙ্খলা

শুরু হয়, যা পুরো গ্রাম মনে রেখেছে। রিনার বাবা আরডিআরএসের কমিউনিটি অ্যানিমেটর সিদ্দিককে চিনতেন। ঘটনার পরপরই তিনি সিদ্দিককে বিষয়টি জানান। সিদ্দিক একই গ্রামে থাকতেন। দুই পরিবারই তার প্রতিবেশী। এটি ছিল রিনা ও তার পরিবারের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা। কারণ যখনই প্রয়োজন পড়ত তারা সিদ্দিককে পেতেন। রিনার বাবা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে তার আগ্রহের কথা জানান। তবে সিদ্দিক তাদেরকে প্রথমে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে বলেন। পাশাপাশি মামলা দায়ের করার জন্য মেডিকেল সনদ নিতে বলেন। রহিমের পরিবারও মামলা দায়ের করতে আগ্রহী ছিলেন। সিদ্দিক মামলা দায়ের না করে মধ্যস্থতা করার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। কারণ রিনা ও রহিমের দুটি সন্তান রয়েছে। রহিমের মারধরে প্রচণ্ড আহত হওয়ায় রিনাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে আনার পর রিনা ও তার বাবা রিনার সাংসারিক বিরোধ এবং জমিসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সালিশ ডাকতে চান। শুরুতে রহিমের পরিবারও সালিশ চেয়েছিলেন। তারা সালিশের তারিখের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে যান। চেয়ারম্যান রিনার জন্য সালিশ ডাকতে রাজি হন, কিন্তু পরে রহিমের পরিবার মত পাল্টায়। রিনার মতে, ঢাকায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সঙ্গে তার শ্বশুরের পরিচয় ছিল। ঢাকায় থাকার সময় এসব প্রভাবশালীর সঙ্গে রহিম ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তবে রহিমের পরিবার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সালিশ আর হয়নি।

সিদ্দিক রিনার বাবাকে পরামর্শ দেন—তিনি যেন ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌতুক নির্যাতনের মামলা করেন। কারণ রিনার মেডিকেল সনদ ছিল। সিদ্দিকের পরামর্শে রিনা ও তারা বাবা থানায় গিয়ে রহিমের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সিদ্দিকও তাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তবে দায়িত্বরত পুলিশ পরিদর্শক লাহাব মামলা নিতে অনাগ্রহ দেখান। এর পরিবর্তে তিনি মধ্যস্থতার পরামর্শ দিয়ে বলেন, মামলা পরিচালনা করা ব্যয়বহুল। তার মতে, মধ্যস্থতাই দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ভালো। সেজন্য রিনা ও তার বাবা মামলা দায়ের করেননি। রিনার মনে হয়েছিল পুলিশ কর্মকর্তা লাহাব সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। রিনা তার মামলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকার ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলেন। অন্যদিকে, রহিম ও তার পরিবার রহিমের বাবার পায়ে আঘাত করার দায়ে একটি মামলা দায়ের করতে চায়। এবারও পুলিশ কর্মকর্তা লাহাব মামলা না নিয়ে মধ্যস্থতার পরামর্শ দেন। বারবারই দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরামর্শ দেয় বা চেষ্টা করে মধ্যস্থতা করার। তবে মধ্যস্থতা করা পুলিশের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না; কিন্তু সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত বা সমাজেরও এমনই আকাঙ্ক্ষা থাকে। অবশ্য রিনা এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান।

পুলিশ কর্মকর্তা লাহাবের পরামর্শ অনুযায়ী, রিনা ও তার বাবা ২০২০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যস্থতার জন্য একটি সালিশ ডাকতে চান। রহিমের পরিবার সালিশে অংশ নিতে রাজি হয় কিন্তু পরে দাবি করে রহিমের বাবার সুস্থ হতে আরও সময় দরকার। পুলিশ কর্মকর্তা লাহাব পরামর্শ

দেন, রহিমের বাবা যেহেতু অসুস্থ তাই তাদের বাড়িতেই সালিশের আয়োজন করা হোক অথবা যেখানে রহিমের বাবার সুবিধা হবে সেখানেই। কিন্তু রহিমের পরিবার রাজি হয়নি। রিনা বুঝতে পেরেছিলেন এটি রহিমদের কোনো পরিকল্পনার অংশ। কিছুদিন পরই রহিম ও তার বাবা গোপনে ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আদালতে গিয়ে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে আসেন। রিনার পরিবারের বিরুদ্ধে তারা টাকা ও সোনা চুরির অভিযোগ করেন। তারা মধ্যস্থতার ব্যাপারে পুলিশ পরিদর্শক লাহাবের পরামর্শ অমান্য করেন। রিনার পরিবারের অনেক সদস্যকে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। এমনকি যারা ঘটনার দিন উপস্থিত ছিলেন না, তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়।

> “আমার পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে তারা মামলা দায়ের করেন, এমনকি সেদিনের ঘটনায় যারা জড়িত ছিলেন না, তাদের বিরুদ্ধেও! আমার বাবা, চাচা, ফুপু, ভাই এমনকি আমার ছোট ছোট ভাইবোন– সবার বিরুদ্ধে!
>
> –রিনা

রিনার শ্বশুরকে মারধর করার অপরাধে রিনার পরিবারের মোট নয়জন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ একটি কমিটি গঠন করে। তারা রিনাদের বাড়ি তল্লাশি করতে আসে। রহিমের পরিবার জানত যে আদালতের প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। রিনা দাবি করেন রহিমের পরিবার মামলার প্রক্রিয়া বেগবান করতে মামলার আইনি নথিপত্র রংপুর থেকে কাটাপুরে নিয়ে আসতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দেয়। এছাড়াও রিনা দাবি করেন রহিমের পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুক্ত ছিলেন। তারা আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। এটি রহিমের পরিবারের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা ছিল। শেষমেশ, মাননীয় আদালত রিনার বাবার অনুকূলে এই মর্মে রায় দেন যে, এটি একটি মিথ্যা মামলা ছিল। তবে রিনার শ্বশুর এই রায় মেনে নেননি।

রিনার পরিবার যখন আদালতের নোটিশ পায়, তখন পুলিশ পরিদর্শক লাহাব পরামর্শ দেন তারা যেন রিনার শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। তার কথা অমান্য করে গোপনে রহিমের পরিবার আদালতে গিয়ে মামলা দায়ের করায় পুলিশ পরিদর্শক লাহাব বিরক্ত হয়েছিলেন। এরপর আবার পুলিশ পরিদর্শক লাহাবের পরামর্শে ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে রিনা মামলা দায়ের করেন। সেদিনই রহিম গ্রেপ্তার হন।

২০২০ সালের ৮ অক্টোবর পারিবারিক নির্যাতন (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের ১১(৩) ধারায় রহিমের বিরুদ্ধে রিনা আরেকটি মামলা দায়ের করেন। রিনার পরিবার পরিচিত আইনজীবী হারুনের পরামর্শে ভরণপোষণ ও সুরক্ষা (আইনি ভাষ্য ১০ দেখুন) পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই মামলা দায়ের করে। হারুন পরামর্শ দেন এই আইনে মামলা করলে রিনা ভরণপোষণ পাবেন,

পাশাপাশি রিনার নিজের তৈরি বাড়িতে থাকার সুরক্ষাও তিনি পাবেন। নিজের গড়া বাড়িতে থাকা এবং ভরণপোষণের অর্থ আদায়ে রিনা দ্বিতীয় মামলাটি করেন।

আইনি ভাষ্য ১০

বাংলাদেশের পারিবারিক আইনে নারীদের নিজেদের বৈবাহিক সূত্রের বাড়িতে থাকার অধিকার কিংবা সেই বাড়িতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাই এই সুরক্ষা আদেশ সত্যিই একটি ভালো উদ্ভাবন। একই সঙ্গে, যেসব ক্ষেত্রে দম্পতি যৌথ পরিবারে থাকে, সেখানে এই আদেশ বলবৎ করা কঠিন। এক্ষেত্রে, যেহেতু একটি আলাদা বাড়ি ছিল, তাই এই আইন বলবৎ করার সুযোগ ছিল। পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনে নারীর পারিবারিক বাড়িতে থাকার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু তা শুধু তখনই প্রযোজ্য—যদি তারা বিদ্যমান পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন। তবে পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের অস্তিত্ব এবং তার সমাপ্তি (যেমন: তালাকের মাধ্যমে) নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত আইন দ্বারা, যা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভেদে আলাদা হয়। সেজন্য নারীর বৈবাহিক সূত্রের বাড়িতে বসবাস করার অধিকার নির্ভর করে তারা কি মুসলিম, হিন্দু, নাকি খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইনে বিয়ে করেছেন, নাকি বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে করেছেন। ব্যক্তিগত আইনের কোনোটিই নারীর পারিবারিক বা বৈবাহিক সূত্রের বাড়িতে থাকার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না।

পঁচিশ দিন রহিম জেলে ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রিনাকে রহিম তালাকের নোটিশ পাঠান (আইনি ভাষ্য ১১ দেখুন)। রিনার দাবি, বিজ্ঞ বিচারক তাকে বলেছিলেন যেহেতু রিনা রহিমের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এবং রহিমের বাবাকে রিনার বাবা মারধর করেছেন, তাই রহিম তালাকের নোটিশ পাঠাবেন এটাই স্বাভাবিক।

আইনি ভাষ্য ১১

তিন মাসের বেশি হয়েছে রহিম রিনাকে তালাকের নোটিশ পাঠিয়েছেন। সেজন্য তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। মামলা চলাকালে, কোনো ধরনের আইনি জটিলতা ছাড়া তালাক কার্যকর হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, তালাক দিলেও স্বামীর বাধ্যবাধকতা থাকে (ভরণপোষণ, দেনমোহর এবং প্রতিপালনের বিষয় যদি থাকে, তাহলে মামলা চলবে)। তবে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে এটি একটি চ্যালেঞ্জ। এই আইনের আওতায় যে কোনো মামলা দায়ের করলে, দুই পক্ষের পারিবারিক সম্পর্ক একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই যখন একটি মামলা ঝুলে থাকা অবস্থায় দুই পক্ষের তালাক হয়, তখন অপর পক্ষ এসব মামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেজন্যই নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

রিনা এখনও তার দেনমোহরের টাকা পাননি। মাননীয় আদালতের রায় নিয়ে তার বাবার আপত্তি আছে। তার আপত্তির জায়গা হলো, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় অন্য চারজন অভিযুক্তের নাম বাদ দিয়ে আদালত শুধু রহিমের নাম রেখেছেন। সেজন্য মামলা এখনও অনিষ্পন্ন। তাই রিনা এখনও টাকা পাননি।

সিদ্দিকের মতে, পুরো প্রক্রিয়ায় রিনার বেশি কিছু বলার ছিল না। তাছাড়া মাননীয় আদালতের বিবরণীও তিনি বেশি কিছু বোঝেননি।

> “প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কোনো কিছু জিজ্ঞেসও করেননি। কোনো কিছু না বুঝেই রিনা আদালতে যেতেন। তার মনে সত্যিকার অর্থে রহিমের জন্য ভালোবাসা ছিল।
>
> —সিদ্দিক

তালাকের পর রিনার বাবা জমিসংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে আলাদা সালিশ ডাকেন। সর্বশেষ সালিশ বসেছিল ইউনিয়ন পরিষদে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেই সালিশ পরিচালনা করেন। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী চলা সেই সালিশে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রহিম রিনাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হন। উভয় পক্ষকে নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে বলা হয়। সবশেষে রিনার নামে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু জমি লিখে দেওয়া হয়। দুই পরিবারই সিদ্ধান্ত মেনে কাগজে সই করে। তবে রহিমের পরিবার পরে প্রভাবশালী কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা রিনার নামে জমি লিখে দেওয়ার শর্তের সঙ্গে দেনমোহরের বিষয়টি যুক্ত করার পরামর্শ দেন। রহিম ও তার পরিবার সেসব লোকের কথা মেনে সালিশের সিদ্ধান্ত অমান্য করে। চেয়ারম্যান এসব শুনে অপমানিত বোধ করেন। তিনি রিনার বিষয়টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন দুই পরিবার আর একক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত তালাকই চূড়ান্ত হয়। এখন রহিম ঢাকা থেকে রংপুর এসে আদালতে হাজিরা দিয়ে আবার ফিরে যান।

উপসংহার

রিনার বাবা ও তার শ্বশুরের দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে রিনার সংসারে। এখানে তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রিনার ঘটনা থেকে দেখা যায়, বিয়ের কোনো বিকল্প না থাকায় নারীরা কী ধরনের প্রতিকূলতার মুখে পড়েন। কারণ নিরাপত্তা ও টিকে থাকার কোনো বিকল্প নারীদের থাকে না। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সমাজ আরোপিত ‘কলঙ্ক’ এবং সন্তানের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা। রিনা যখন রহিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, তখন তিনি রহিম ও তার পরিবারকে নির্যাতনের দায়ে সাজা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, মামলা দায়ের করা মানে তার বিয়ে হুমকির মুখে পড়বে এবং সংসার ভেঙে যাবে। তালাক হয়ে যাওয়ার

পর রহিম তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করছেন। রিনা নিজেকে 'পরাজিত' ভাবছেন। যখনই তিনি ভাবেন যে নিজের গড়া বাড়ি, নিজের কেনা আসবাব ও বাসনপত্র এবং যে মানুষটাকে তিনি ভালোবেসেছেন– এসব কোনো কিছুতেই তার আর অধিকার নেই, তখন তার হৃদয় ভেঙে যায়। রিনার ভাষায়, "আমার গড়া ঘরে আমারই কোনো অধিকার নেই।"

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

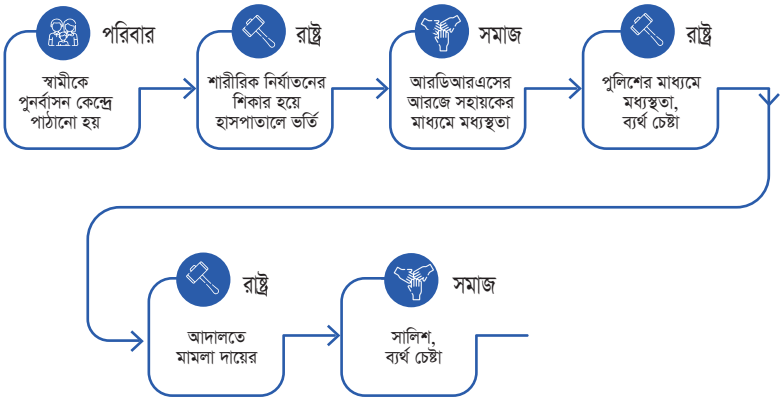

একজন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিয়তি

মিতা

পোশাক কারখানা থেকে কাজ শেষে কর্মীরা বাড়ি ফিরছেন। মিতা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর একজন নারী। তিনি একটি তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। কাজে যাওয়ার পথে একজন বিবাহিত লোক তার পিছু নিত। এখন সেই লোকটিই মিতার স্বামী।

ঙ. একজন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিয়তি: মিতা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

অভিবাসন, তৈরি পোশাক কর্মী, বহুবিবাহ, ইউনিয়ন পরিষদের সালিশ, ব্র্যাক এইচআরএলএস, তালাক, ভরণপোষণ, চুরি

ভূমিকা

মিতার গল্পটি হলো এমন এক নারীর, যিনি স্বাধীনভাবে ঢাকায় অভিবাসিত হয়ে নিজেই উপার্জন করছিলেন। কিন্তু তিনি এমন এক লোককে বিয়ে করতে বাধ্য হন, যিনি আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন। এরপর তিনি তার স্বামীকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা শুরু করেন। মিতা টাকা জমান; গহনা ও ঘরের জিনিসপত্র কেনেন। তার জমানো টাকা ও সম্পদ সবই তার স্বামী এবং স্বামীর প্রথম স্ত্রী দখল করে নেন। একটি ছেলে হওয়ার পর মিতা যখন নিজে আর উপার্জন করতে পারছিলেন না, তখন তার স্বামী তাকে তালাক দেন। এখন ব্র্যাক এইচআরএলএস ধার্য করে দেওয়ার পরও তার স্বামী তাকে ভরণপোষণের খরচ দিচ্ছেন না।

বৃত্তান্ত

মিতা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তবে আর্থিক উপার্জন করতে গিয়ে তাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছিল। পনেরো বছর বয়সে মিতা ঢাকায় চলে আসেন। কারণ তার বাবা-মা তাকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ঢাকায় আসার পর বাবা-মায়ের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। তিনি তার এক বান্ধবীর সঙ্গে থাকতেন। মোমেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোমেন ছিলেন পেশায় মাছ বিক্রেতা। তার সঙ্গে মিতার বিয়ে হয়।

বিয়ের সময় মিতার বয়স ছিল একুশ আর মোমেনের চল্লিশ। মিতাকে বিয়ে করার আগে থেকেই মোমেন বিবাহিত ছিলেন। তার দুটি সন্তানও ছিল। মিতা ও মোমেনের এখন একটি ছেলে আছে। ছেলের বয়স দুই বছর। বর্তমানে ছেলেকে নিয়ে মিতা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ফুলবাড়িয়ায় থাকেন। মিতার বড় ভাই স্ত্রী-সন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর তার বাবাই পরিবারের একমাত্র

উপার্জনকারী ব্যক্তি। মিতার বাবা একটি কমিউনিটি সেন্টারে বাবুর্চি হিসেবে কাজ করেন। তার আয় দিয়ে পুরো পরিবার চলে। তবে বার্ধক্য ও অসুস্থ শরীর হওয়ায়—প্রায় সময়ই তিনি কাজে যেতে পারেন না।

কেস

মিতা ঢাকায় এসে কাজ শুরু করেছিলেন। মিতা যে কারখানায় কাজ করতেন, মোমেন তার পাশেই মাছ বিক্রি করতেন। মিতা ও মোমেনের দেখা হয় একটি স্থানীয় বাজারে। এরপর থেকে মোমেন মিতার পিছু নেন। মিতার বাড়িওয়ালার নজরে আসে বিষয়টি। অল্পবয়সী অবিবাহিত মিতার ব্যাপারে দায়িত্ববোধ থেকে বাড়িওয়ালা তার উদ্বেগের কথা জানান মিতাকে। মোমেনের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্কের কথা মিতা অস্বীকার করেন। উল্টো তিনি বাড়িওয়ালার কাছে অভিযোগ করেন, মোমেন প্রতিদিন তার পিছু নেয়। বাড়িওয়ালা যখন মিতার পিছু নেওয়ার ব্যাপারে মোমেনকে প্রশ্ন করেন, তখন মোমেন জানান মিতাকে তিনি বিয়ে করতে চান। কিন্তু মিতা এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে সংসার করতে হলে শ্বশুর-শাশুড়ির স্বীকৃতি প্রয়োজন। তাই মোমেনের বাবা-মায়ের উপস্থিতি ছাড়া মিতা বিয়ে করতে রাজি হননি। এরপর মোমেন তার এক চাচা ও চাচাতো ভাইকে এনে তাদেরকেই নিজের অভিভাবক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। তবুও মিতা বিয়েতে রাজি হননি কারণ, তিনি জানতেন মোমেন বিবাহিত। তবে মোমেনের চাচা ও চাচাতো ভাই সবাইকে নিশ্চিত করেন যে, মোমেনের আগের স্ত্রীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মিতা মোমেনের চাচা, চাচাতো ভাই এবং বাড়িওয়ালার উপস্থিতিতে বিয়ে করেন। তারা মিতার বাবা-মাকে বিয়ের কথা জানাননি।

বিয়ের পর মিতা প্রথম পনেরো দিন টঙ্গীতে ছিলেন। তার কিছু আত্মীয়স্বজন আশপাশেই থাকতেন। যেহেতু মিতার বাবা-মা বিয়ে সম্পর্কে জানতেন না, তাই মোমেন টঙ্গী থেকে গাজীপুরের মাওনায় গিয়ে বাসা নেন। তার ভয় ছিল টঙ্গীতে থাকলে মিতার পরিবার তাদের খোঁজ পেয়ে যাবেন। তিন বছর তারা মাওনায় ছিলেন। মিতা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে মাওনায় সুখে-শান্তিতেই সংসার করছিলেন। সে সময় মোমেন মিতার প্রতি মাসের বেতনের টাকা দিয়ে সংসার খরচ চালাতেন।

মিতা জানান, বিয়ের শুরু থেকেই তার পরিবারের কারো সঙ্গে মোমেন যোগাযোগ করতে দেননি। বিয়ের পরেও মিতার বাবা-মা তার কোনো খোঁজখবর জানতেন না। মিতা যখন জানতে পারলেন তার বড় ভাই প্রচণ্ড অসুস্থ, তখন তিনি ফুলবাড়িয়ায় যান। মিতার সঙ্গে কাজ করতেন আরেকজন পোশাক কর্মী। তিনি-ও মিতাদের গ্রামেরই। তার কাছ থেকে ভাইয়ের অসুস্থতার কথা শুনে মিতা তাকে দেখতে যান। কিছুদিন পরই তার ভাই মারা যান। ফুলবাড়িয়ায় থাকাকালীন মিতা জানতে পারেন প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়নি। ক্ষিপ্ত হয়ে মিতা ঢাকায় আসেন, কিন্তু তার স্বামীকে জানাননি। ঢাকায় এসে মোমেনের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে মিতা এক বান্ধবীর বাসায় ওঠেন। কিন্তু মোমেন জেনে যান। এরপর তিনি মিতাকে নিয়ে

ভালুকজানে একটি বাসা ভাড়া নেন। মিতা যখনই তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইতেন কিংবা মোমেনকে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন, তখনই মোমেন তাকে মারধর করতেন।

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজানে আসার পর মিতার কোনো চাকরি ছিল না। মাওনায় পোশাক কারখানায় কাজ করার সময় বেতন থেকে টাকা জমানোর জন্য ব্যাংকে একটি ডিপিএস খুলেছিলেন। মিতা যখন মাওনা ছেড়ে চলে আসেন, তখন তার স্বামী ডিপিএসের এক লাখ বিশ হাজার টাকা মিতাকে দিয়ে তুলিয়ে নিজে নিয়ে নেন। এরপর যখন মোমেনের বাবা-মায়ের সঙ্গে তার প্রথম স্ত্রীর ঝগড়া হয়, তখন মিতার ডিপিএসের টাকা দিয়ে তার প্রথম স্ত্রীর জন্য একটি আলাদা বাড়ি বানিয়ে দেন।

একদিন হঠাৎ মোমেন তাদের বিয়ের কাবিননামা খোঁজা শুরু করেন। মিতাকে না জানিয়েই ট্রাংক থেকে তিনি বিয়ের কাবিননামা নিয়ে নেন। মিতা যখন কারণ জানতে চান, তখন মোমেন বিয়ের কাবিননামা ফিরিয়ে দেবেন বলে জানান। বিয়ের কাবিননামা লুকিয়ে ফেলার পর মোমেন মিতাকে বলেন, মাছ বিক্রি করতে তিনি সাগরদিক যাবেন। পনেরো দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কারণ ফুলবাড়িয়ায় ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। যাওয়ার সময় মিতাকে যোগাযোগের কোনো ঠিকানা বা ফোন নম্বর দিয়ে যাননি। এমনকি মিতার খাবারের কোনো ব্যবস্থাও করে যাননি, যদিও সে সময় মিতা তিন মাসের গর্ভবতী ছিলেন। তার ওপর তখন মিতার কোনো চাকরিও ছিল না। মিতা একমাসেরও বেশি সময় স্বামীর অপেক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত ঘাটাইলের সাগরদিক যান স্বামীকে খুঁজতে। সেখানে মিতাকে দেখে মোমেন পালিয়ে যান।

ফুলবাড়িয়ায় ফিরে আসার পথে মিতা মোমেনের চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নিজেকে মোমেনের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। মোমেনের চাচাতো ভাই মিতাকে নিশ্চিত করেন যে তিনি মোমেনকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবেন। কয়েকদিন পর, মিতার দেবর এবং চাচা-শ্বশুর মিতা ও মোমেনের সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসেন। আলোচনায় আত্মীয়স্বজন বলেন, মোমেনের উচিত দুই স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দুইজনকেই একসঙ্গে ভরণপোষণ দেওয়া। দুইজনেরই ছাড় দিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখা উচিত, যেহেতু মিতা গর্ভবতী।

> “
> ভুল যেহেতু হয়েই গেছে, তখন আর কিছু করার নেই। এখন তোর দুই পরিবার। দুইজনেরই বুদ্ধিমানের মতো এখন কাজ করা উচিত। সবচেয়ে ভালো যা হয়, আমরা তা-ই চাই। দুই পরিবারেই শান্তি বজায় রেখে থাকো। এটাই আমরা চাই। মোমেন সেখানেও যাবে, এখানেও আসবে। সন্তান যখন হয়ে গেছে, তখন এর বাইরে আর কিছু করার নেই।
>
> —মিতার চাচা-শ্বশুর

মিতার চাচা-শ্বশুর ও দেবরের হস্তক্ষেপে সাময়িক সমাধান হয়েছিল। একদিন মোমেন স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার হিরাকে বলেন তিনি যেন একটি সালিশের ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি দুই পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছেন না। মিতা যেহেতু এখন চাকরি করেন না, তাই পরিবারের পুরো খরচই মোমেনকে বহন করতে হচ্ছিল। মিতার ভরণপোষণের খরচ কর্তন করে তিনি আর্থিক সংকট কাটানোর চেষ্টা করেন।

সালিশে কমিশনার হিরা মিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন যে—এখন যদি মিতা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ তিনি যে—এখন গর্ভবতী, তার সেবাযত্নের প্রয়োজন। বাংলাদেশে গর্ভবতী-মায়ের সেবাযত্ন নারীর পরিবারের দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। হিরার পরামর্শ সেই ধারণাই জোরদার করে। তাছাড়া হিরা নিশ্চিত করেন যে মোমেন নিয়মিত তাকে দেখতে যাবেন এবং যা দরকার তা দেবেন। তবে সালিশের কয়েকদিন পরেই মোমেন আর মিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। মিতা তখন কমিশনারের কাছে গিয়ে জানান, মোমেন সালিশের সিদ্ধান্ত মানছেন না।

তখন কমিশনার হিরা দ্বিতীয় আরেকটি সালিশ ডাকেন। কমিশনারের কাছে মিতা অভিযোগ করেন ভালুকজান ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে মোমেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বা তার ভরণপোষণও দেননি। সালিশে মিতার স্বামী আবারও মেনে নেন যে তিনি মিতার ভরণপোষণের খরচ দেবেন। কিন্তু সালিশের পর আর সে কথা রাখেননি। কিছুদিন পর, কমিশনার হিরা মিতার ক্রমাগত অভিযোগ এবং মোমেনের অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে মিতাকে জানান—তার যা ইচ্ছা তা-ই যেন করেন, যেহেতু মোমেন কথা শুনছেন না। কমিশনার এ-ও বলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি মোমেনের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেবেন—যদি মিতা মামলা করেন। তবে মিতা সে সময় এ বিষয়ে আর কিছু করেননি, যেহেতু তার গর্ভকালের শেষ মুহূর্ত চলছিল।

তা সত্ত্বেও, কমিশনারের সালিশের সিদ্ধান্ত ও ফলাফল নিয়ে মিতা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে কমিশনার হিরার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরক্ত ছিলেন যে—মিতার যেহেতু গর্ভাবস্থায় সেবাযত্ন দরকার, তাই বাবার বাড়ি গিয়ে থাকা উচিত। এই সিদ্ধান্তের কারণেই মিতা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন। মিতা বলেন,

> “এই সময়ের মধ্যে তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করেননি। যখন আমি কমিশনারের কাছে গেলাম, তিনি বললেন, “আমি কী করতে পারি? সে কথা শোনে না!” আপনি জানতেন না যে তিনি কথা শোনেন না? তাহলে কেন আপনি তালাকের সিদ্ধান্ত দিলেন?

২০২০ সালে মিতার ছেলে জন্ম নেয়। মিতার বাবা-মা এই খবর মোমেনের কাছে পাঠান। কিন্তু মোমেন নিজের ছেলেকে দেখতে আসেননি। পরে কমিশনার হিরা এবং স্থানীয় নেতা ফজলুর

মিলে মোমেনের বাড়ি গিয়ে তাকে জোর করে নিজের ছেলেকে দেখতে নিয়ে আসেন। মোমেন দশ মিনিটের মতো সেখানে ছিলেন। ফজলুর ও কমিশনার চলে যাওয়ার পরপরই মোমেন চলে যান।

মিতার সন্তান প্রসবের সময় মোমেন ভালুকজানে মিতার বাড়িতে ঢোকেন। বাড়িওয়ালার কাছে মোমেন তার প্রথম স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেন মিতার ননদ বলে। আর তার মাকে মিতার খালা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনজন মিলে মিতার আসবাবপত্রসহ ঘরের অন্যান্য জিনিস নিয়ে যান, যেমন: ফ্রিজ, কাপড়-চোপড় এবং গহনা। মিতা এগুলো নিজের টাকায় কিনেছিলেন। ঘটনার তিন দিন পর মিতার বাড়িওয়ালা মিতাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, কেন তাকে না জানিয়ে ঘর খালি করে ফেলেছেন। মিতা তার ঘরে ছুটে আসেন। এসে দেখেন গহনা, ফ্রিজ, কাপড় ইত্যাদি নেই। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন সব জিনিসপত্র তার শাশুড়ির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তখন মিতা ব্র্যাকের এইচআরএলএসের সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার গহনা ও জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ছিল একটি বাঁকবদল। এই ঘটনায় মিতা নিজেকে প্রতারিত বলে মনে করেন। তাই তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার বাবা ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কথা জানতেন। তিনি-ই তাকে ব্র্যাকে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এর মধ্যে তার স্বামী তাকে তালাকের নোটিশ পাঠান। কিন্তু মিতা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মিতা তার চার দিন বয়সী ছেলেকে নিয়ে ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কার্যালয়ে যান। সেখানে এইচআরএলএসের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। মিতার অভিযোগ গ্রহণের পর ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কর্মকর্তা মোমেনের কাছে বিয়ের বিষয়ে সমঝোতা করতে বিকল্প বিবাদ নিরসন (এডিএস) পদ্ধতির কথা জানিয়ে নোটিশ পাঠান। প্রথম দুটি নোটিশের কোনো জবাব দেননি মোমেন। তৃতীয় নোটিশের পর মোমেন ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কার্যালয়ে হাজির হন। তিনি জানান দেনমোহর ও ভরণপোষণের টাকা দিতে রাজি আছেন, তবু মিতাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

আর কোনো উপায় না দেখে এইচআরএলএসের কর্মকর্তা দেনমোহর বাবদ এক লাখ দশ হাজার টাকা দাবি করেন। তবে মিতা জানান দেনমোহরের টাকা কমিয়ে সত্তর হাজার করা হয়েছিল। বিকল্প বিবাদ নিরসনের জন্য এইচআরএলএসের পক্ষ থেকে কমিশনার আকবরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই কমিশনার টাকা কমিয়ে সত্তর হাজার করেছিলেন। মিতা জানান তিনি তালাক দিতে চাননি। কিন্তু তারা তাকে তালাক মেনে নিতে চাপ দেন। কারণ হিসেবে তারা বলেন, তার স্বামী সংসার করতে রাজি নন। তাই দেনমোহরের টাকা এবং মাসিক দুই হাজার করে ভরণপোষণের টাকা নিয়ে তালাক দেওয়াটাই তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। যদিও মোমেন দেনমোহরের টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু তালাকের পর সন্তানের ভরণপোষণের টাকা দেননি। এ সবকিছুর কারণে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি মিতার আস্থা কমে গেছে।

“

আমি তালাক দিতে চাইনি। পরে তারা বললেন, তিনি (মোমেন) আমার সন্তানের দেখাশোনা করবেন এবং সন্তানের ভরণপোষণের জন্য মাসে দুই হাজার করে টাকাও দিবেন। তাদের কথায় ভরসা রেখে আমি তালাকে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু এখন তিনি ভরণপোষণ দিবেন দূরে থাক, আমার ছেলের একটা খোঁজও রাখেন না।

—মিতা

এদিকে ওয়ার্ড কমিশনার হিরা ও তার স্ত্রী সালিশে উপস্থিত থেকে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্যের রীতি বজায় রেখে গোটা পরিস্থিতির জন্য সহিংসতার শিকার মিতাকেই দায়ী করেছিলেন। তারা মিতাকে দোষারোপ করেন—কেন তিনি মোমেন সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ে করলেন। যদিও মিতা বলেছেন প্রথম বিয়ের বিচ্ছেদের ব্যাপারে মোমেন তাকে মিথ্যা বলেছেন।

অন্যদিকে, মোমেনের স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও দুটি বিয়ে করার বিষয়টিকে কমিশনার ও তার স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে দেখেছেন। তারা বলেন,

“

তিনি যা করার করেছেন। পুরুষের স্বভাবই হলো আরেকটি বিয়ে করা। তিনি যদি ঠিকমতো খাওয়া-পরা চালিয়ে যেতে পারতেন, আমরা কি তাহলে এত ভাবতাম এই বিষয়ে?

দেনমোহরের টাকা দিয়ে মিতা একখণ্ড জমি কিনে বন্ধক দিয়েছেন। তবে সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রতিশ্রুত টাকা তিনি পান না। তাই মিতা আবার এইচআরএলএসে একটি অভিযোগ করেছেন। এইচআরএলএস এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দুটি নোটিশ পাঠিয়েছে তার স্বামীকে।

ফলোআপ সাক্ষাৎকারের সময়ও মিতা বলেছেন তার স্বামী এখনও ভরণপোষণের টাকা দিচ্ছেন না। তিনি জানান, উল্টো তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী রাস্তায় তাকে মারধর করেছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন তার স্বামী এবং প্রথম স্ত্রী মিলে তার সন্তানের ক্ষতি করবেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। মিতা জানান, মোমেন ও তার প্রথম স্ত্রী তাকে সরাসরি হুমকি দিয়েছেন, ভরণপোষণের টাকার জন্য চাপাচাপি করলে তারা মিতার ছেলের ক্ষতি করবেন। এইচআরএলএস বর্তমানে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের আওতায় মোমেনের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের অর্থ আদায় করতে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

উপসংহার

মিতার কাহিনীর সঙ্গে পারিবারিক সহিংসতার শিকার বহু নারীর মিল রয়েছে। ন্যায়বিচার পেতে এসব নারীকে বহু কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রথমে মিতা পরিবারের মধ্যেই বিষয়টির সুরাহার চেষ্টা করেন। যখন পরিবার দিয়ে কাজ হয়নি, তখন সমাজ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাহায্য চান। যখন সামাজিক সালিশের মাধ্যমেও কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি, তখন তিনি এনজিওর কাছে সহায়তা চান। তবে বিভিন্ন ধরনের যত সালিশ ও মধ্যস্থতা হয়েছে, তাতে মিতা সন্তুষ্ট নন। যদিও তিনি সংসার টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তালাক দিতে হয়; এজন্য তিনি সালিশকারদেরই দায়ী করেন। ভরণপোষণের টাকায় সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে—ব্র্যাকের এইচআরএলএসের এমন মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত মিতা তালাক দিতে রাজি হন। কিন্তু ভরণপোষণের টাকা তিনি আর পাননি।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

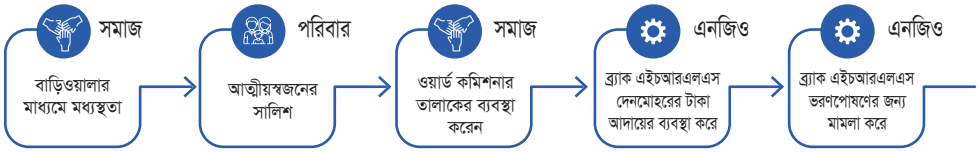

তার মা মনে করেন সে আর আগের মতো নেই

সাদিয়া

একজন প্যানেল আইনজীবী এবং ব্লাস্টের প্যারালিগ্যাল একটি অভিযোগের নথি নিয়ে পটুয়াখালীর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্রবেশ করছেন। সাদিয়ার ঘটনার প্রতীকী ছবি।

চ. তার মা মনে করেন সে আর আগের মতো নেই: সাদিয়া

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

অভিবাসী শ্রমিক, স্বামীর একাধিক বিয়ে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, ব্লাস্ট, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, একাধিক যুগপৎ ঘটনা, যৌতুক নিরোধ আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, হেল্পলাইন ১০৯

ভূমিকা

সাদিয়ার বয়স আটাশ বছর। বাড়ি পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায়। বিয়ের শুরু থেকেই তার স্বামী ও শাশুড়ির হাতে তিনি শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নির্যাতনের ফলে যে ধরনের মানসিক প্রভাব তার ওপর পড়েছে, তা খুবই ভয়াবহ। সাদিয়ার বাবা-মা তার সাম্প্রতিক আচরণকে 'অনুমানের বাইরে' বলেছেন। মাঝে মাঝে তিনি একদম শান্ত ও চুপচাপ বসে থাকেন, আবার হঠাৎ ছোটখাটো বিষয়ে রাগে চিৎকার করতে থাকেন। তার শাশুড়ি ও স্বামী তাকে প্রচণ্ড মারধর করেছিলেন। তার স্বামীর নাম নবীন, বাড়ি মির্জাগঞ্জ। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী নবীন একজন সিএনজিচালক। ঝগড়ার সময় সাদিয়াকে অনেকবার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে মারধরের কারণে সাদিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার স্বামী তাকে চোর বলেও অপবাদ দেন। সাদিয়া তার সংসার টিকিয়ে রাখতে পরিবার, সমাজ, এনজিও এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সাদিয়ার কাহিনী থেকে দেখা যায়—কীভাবে পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীর সার্বিক মঙ্গল বিনষ্ট হয় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে। এর মাধ্যমে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের সক্ষমতা নাজুক করে দেয়।

বৃত্তান্ত

সাদিয়া দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর সংসারের জন্য আয়রোজগার করতে গিয়ে তাকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছে। তার পরিবার পটুয়াখালীতে গ্রামে যাওয়ার আগে তিনি

ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। ২০১৭ সালে নবীনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নবীন পাশের গ্রাম মহেশখালীর একজন সিএনজিচালক। এই দম্পতির তিন বছর বয়সী একটি ছেলেসন্তান রয়েছে।

সাদিয়ার বাবা গ্রামের একজন আনসার সদস্য। সাদিয়া ঢাকায় বেড়াতে যাওয়ার পর তার সাবেক এক সহকর্মী এবং নবীনের এক বোন তাদের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। বিয়ের সময় যদিও সাদিয়ার বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি ছিল বলেও মনে হয়নি।

নবীন আগে আরও তিনবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু স্ত্রীদের সবাই নবীনের মায়ের নির্যাতনের কারণে চলে গেছে বলে জানা যায়। আগের বিয়েগুলোর কথা নবীন সাদিয়ার কাছে গোপন রাখেন। কিন্তু পটুয়াখালীতে আসার পর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাদিয়া সব জানতে পারেন।

করোনা অতিমারির কারণে নবীন সিএনজি চালানোর কাজ হারান। এখন মাঝেমধ্যে অন্য চালকদের হয়ে সিএনজি চালান। স্থায়ী কোনো আয়রোজগার না থাকায় তিনি সাদিয়া ও তার সন্তানের ভরণপোষণ ঠিকমতো দিতে পারেন না। নবীন তার মায়ের জন্য খরচ দিয়ে মাঝেমধ্যে সন্তানের জন্য অল্প টাকা পাঠাতেন।

কেস

বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস সাদিয়া ঢাকায় মহাখালীতে স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। তাদের মধ্যে যখন ঝগড়া শুরু হয়, তখন সাদিয়া তার ননদ এবং যে নারী তাদের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন, তাদেরকে মধ্যস্থতা করার জন্য ডাকেন। তারা দুজনই বলেন, যদি একসঙ্গে শান্তিতে থাকতে না পারেন, তাহলে সাদিয়া যেন তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যান। আরেকজন লোক সাদিয়াকে পরামর্শ দেন তিনি যেন মহাখালীর স্থানীয় একজন প্রভাবশালী লোকের কাছে যান। তিনি হয়তো তার স্বামীর খারাপ আচরণ বদলাতে পারবেন। তবে সাদিয়া সাংসারিক বিবাদ মেটাতে সেই ব্যক্তির সহায়তা চাওয়ার পর তার স্বামী, ননদ এবং তার সহকর্মী সবাই তাকে এ নিয়ে বকাবকি করেন।

ঢাকায় থাকার সময় সাদিয়া তার শাশুড়ির কাছে অভিযোগ করেন, তার স্বামী ফোনে আগের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। সাদিয়ার মতে, এরপর তার শাশুড়ি নবীনকে বিষয়টি জানান। কিন্তু সাদিয়া প্রকৃতপক্ষে যা বলেছিলেন, তার শাশুড়ি সেসব কথা নবীনকে বিকৃত করে বলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় নবীন সাদিয়াকে মারধর করেন। অথচ তিনি তখন আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন। এছাড়াও নবীন গরম পানি দিয়ে তার পা পুড়িয়ে দেন। বস্তির ম্যানেজার এবং তার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাদিয়াকে উদ্ধার করতে গিয়ে ম্যানেজারের স্ত্রীরও পা পুড়ে যায়। এই ঘটনার পর, ম্যানেজারের স্ত্রী নবীনকে একটি শেষ শর্ত দেন:

“

ম্যানেজারের স্ত্রী বলেছিলেন, ‘যদি তিনি (নবীন) আর একবার তার স্ত্রীকে মারধর করেন, তাহলে নারীরা সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।’

—সাদিয়া

পরবর্তীকালে সাদিয়ার শাশুড়ি, বোন এবং ননদ সাদিয়াকে ঢাকা থেকে চলে এসে পটুয়াখালীতে গ্রামে বসবাস করতে রাজি করান। তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ২০১৮ সালে পটুয়াখালীতে চলে আসেন। তার শাশুড়ি সুবিদখালীতে তাদের একখণ্ড জমি দেওয়ার পর (তার স্বামীর নানির ভাগ থেকে পাঁচ কোরা[৬]) সেখানে তারা নতুন একটি বাড়ি বানান। সাদিয়ার শ্বশুরের সঙ্গে তার শাশুড়ির ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে তার শাশুড়ি নিজের ভাইদের সঙ্গে থাকতেন। সাদিয়া তার স্বামীকে একটি রিকশা কিনে দেন। ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি নতুন বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ আনেন। নবীনের সঙ্গে তিনি নতুন বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

কিছুদিন পর নবীনের উপার্জন দিয়ে সাদিয়ার শাশুড়ি একখণ্ড জমি কেনেন। নিজের নামে জমির দলিল না করে সাদিয়ার শাশুড়ি তার বাবার নামে দলিল করেন। নবীন বুঝতে পারলেন এই জমির উত্তরাধিকার শুধু তিনি একা হবেন না, কারণ দলিল হয়েছে তার নানার নামে। পরে এ নিয়ে মা-ছেলের দ্বন্দ্ব বাধে।

সাদিয়ার মতে, পটুয়াখালী আসার পর থেকে তার শাশুড়ি বাড়ির সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন। খাবার-দাবার তালা দিয়ে রাখতেন। সাদিয়া কতটুকু রান্না করবেন, তা-ও তিনি ঠিক করে দিতেন। সাদিয়া তার শাশুড়ির খেয়ালখুশি মানতে পারতেন না। এর ফলে সংসারে সবসময় ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। সাদিয়া জানান, তার শাশুড়ি চেয়েছিলেন নবীন যেন তার মামাতো বোনকে বিয়ে করে। কিন্তু নবীন রাজি হননি। এমনকি সাদিয়া তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় তার স্বামীকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, তার স্বামীর আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সাদিয়া জানান, তার স্বামী মাঝে মাঝে তার ব্যাপারে খুব যত্নশীল থাকতেন, আবার হঠাৎ মারধর করতেন। এ ধরনের আচরণের কারণে সাদিয়া মনে করতেন তার শাশুড়ি নিশ্চয়ই নবীনকে জাদুটোনা করেছেন। এছাড়াও সাদিয়া জানান, তার স্বামী তুলনামূলক সহজ-সরল ছিলেন। সবসময় মায়ের কথা মেনে চলতেন। সাদিয়া যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে যান, তখন তার শাশুড়ি তার সঙ্গে ও তার সন্তানের সঙ্গে নবীনকে যোগাযোগ করতে দিতেন না। তার শাশুড়ি যখন তাকে নির্যাতন করতেন, তখন নবীন তার মাকে বাধা দিতেন না বলেও সাদিয়া জানান। সাদিয়া বুঝতে পারতেন তার স্বামীর ওপর তার শাশুড়ির অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ছিল। তার সঙ্গে তার স্বামীর যৌনমিলনেও বাধা দিতেন তার শাশুড়ি। সাদিয়ার মতে, তার শাশুড়ি নিজের ছেলের স্ত্রীর ব্যাপারে অস্বাভাবিক ঈর্ষাকাতর

[৬] কোরা হলো জমির আয়তনের প্রথাগত একক গণ্ডা বা কানির উপ-একক। ১ কোরা = ২১৭.৮ বর্গফুট

ছিলেন। তাছাড়া কারো সুখের সংসার দেখলেই তার শাশুড়ি বিরক্ত হতেন। সাদিয়ার মতে, এর কারণ হলো তার শাশুড়ির নিজের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। তার শ্বশুর আরেকটি বিয়ে করার পর নিজের ছেলেকে নিয়ে তার শাশুড়ি বাপের বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাদিয়া বলেন, তিনি নবীনকে বিয়ে করতে রাজি হন, কারণ তাকে বলা হয়েছিল নবীন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। তাবলিগেও গিয়েছিলেন নবীন। সাদিয়া ভেবেছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন।

যখন তার সংসারজীবনে সম্পর্কের অবনতি ঘটল, তখন সাদিয়া তার স্বামীকে নবী মুহাম্মদের (স.) সংসারজীবনের গল্প পড়ে শোনাতেন। সাদিয়া চেষ্টা করেছিলেন এর মাধ্যমে নবীনকে স্বামী হিসেবে তার কর্তব্য মনে করিয়ে দিতে। কিন্তু তা কোনো কাজে আসেনি।

> “আমি তাকে বোঝানোর জন্য ধর্মীয় গ্রন্থের সাহায্য নিই। আমি হাদিসের আশ্রয় নিয়ে তার পাশে বসে তাকে পড়ে শোনাতাম একজন স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন। কিন্তু তার পরেও আমি আমার সংসার টিকিয়ে রাখতে পারছি না।
>
> —সাদিয়া

২০২০ সালের ২ মার্চ। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এবং বারবার তার স্বামী ঘর থেকে বের করে দেওয়ায় সাদিয়া আইনি সহায়তা চেয়ে ব্লাস্টে একটি আবেদন করেন। ব্লাস্ট তাদের নীতি অনুযায়ী, বিকল্প বিরোধ নিরসন পদ্ধতির মাধ্যমে মধ্যস্থতার জন্য একটি তারিখ ঠিক করে দেয়—যেন সাদিয়া নির্যাতনের শিকার না হয়ে তার সংসার জীবন টিকিয়ে রাখতে পারেন। তবে নবীন মধ্যস্থতায় হাজির হননি। মধ্যস্থতার জন্য তখন আরও দুটি তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু নবীন একবারও হাজির হননি। ইতোমধ্যে ব্লাস্টে যাওয়ার অপরাধে সাদিয়ার ওপর পারিবারিক নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ব্লাস্ট থেকে কেউ ফোন করলেই সাদিয়ার স্বামী তাকে গালিগালাজ করতেন।

২০২০ সালের আগস্ট মাসে যখন লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করা হলো, তখন মধ্যস্থতার জন্য আরও দুটি তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু সাদিয়া বা তার স্বামী কেউই আসেননি। আগস্ট মাসে, ব্লাস্ট সাদিয়ার কেসটি পটুয়াখালীর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠায়। এরপর সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ঘটনাটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে সমাধানের আদেশ দেন। করোনা অতিমারির কারণে যৌতুক নিরোধ আইনে সাদিয়ার মামলাটি আদালতে যেতে কয়েক মাস লেগেছিল। এর ফলে সাদিয়ার মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। হতাশার আরেকটি কারণ রয়েছে। সাদিয়ার সংসারে ঝামেলার জন্য তিনি তার শাশুড়ি ও শাশুড়ির ভাইকে প্রধানত দায়ী করেছিলেন। কিন্তু জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে যে অভিযোগটি দায়ের করা হয়, সেখানে এ দুইজনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ রাখা হয়নি। এ কারণে সাদিয়া মনে করেছিলেন,

যদি মূল হোতাদেরই বিচার না হয়, তাহলে শুধু তার স্বামীকে সাজা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কারণ সাদিয়ার মতে, তার স্বামী নিজের মায়ের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সাদিয়া মনে করেন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে এই মধ্যস্থতা চালিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন; কারণ তিনি অন্য অভিযুক্তদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারছেন না। ফলে তিনি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে অভিযোগটি তুলে নেন।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগ দায়ের করার কিছুদিন পরই সাদিয়ার স্বামী তাকে মারধর করেন। নবীন সন্দেহ করেন সাদিয়া তার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে। স্বামীর হাতে মারধরের শিকার হয়ে সাদিয়া ১০৯ হেল্পলাইনে কল করেন। সেখান থেকে তাকে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা অতিমারিতে লকডাউন থাকা সত্ত্বেও তিনি থানায় যান। তিনি তার বাবাকে থানায় আসতে বলেন। সাদিয়া চাচ্ছিলেন যেভাবেই হোক শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে পুলিশ যেন বিষয়টি সমাধান করে। তার ভয় ছিল পুলিশের কাছে সহায়তা চাওয়ায় তাকে আবার মারধর করা হতে পারে। পুলিশের সেই কর্মকর্তা সাদিয়ার বাবাকে চিনতেন। এরপর সাদিয়ার বাবা ও পুলিশ কর্মকর্তা দুইজনই সাদিয়ার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেন, যদিও তা পুলিশের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন জোর দিয়ে বলেন সাদিয়াই টাকা চুরি করেছেন। পুলিশ ও সাদিয়ার বাবা চলে আসার দুই দিন পর আবার সাদিয়ার স্বামী ও শাশুড়ি তাকে মারধর করেন। এবার তার শাশুড়ি সাদিয়াকে এমনভাবে আঘাত করেন যে—তার যোনিপথে রক্তপাত শুরু হয়। পুলিশের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে এভাবে মারধর করা হয়।

> “জানেন তখন কী হয়েছিল? আপনি যেহেতু একজন নারী, তাই আপনাকে বলা যায়। তিনি আমার যোনিতে এমন জোরে খামচে ধরেন যে, তাতে আমার যোনির চামড়া ছিঁড়ে বের হয়ে আসে।
>
> —সাদিয়া

এই নির্যাতনের পর সাদিয়াকে সুবিদখালী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা হয়। হাসপাতাল থেকে একটি মেডিকেল সনদ দেওয়া হয়। সেখানে তার আঘাতের বর্ণনা রয়েছে। ওষুধের খরচ নবীন পরিশোধ করেছিলেন।

এরপর সাদিয়ার বাবা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসেন তাকে নিয়ে যেতে। প্রথমে সাদিয়ার স্বামী তাদের সন্তান দিতে রাজি হননি। এরপর সাদিয়া একজন গ্রাম পুলিশকে ডাকেন। তিনি এসে নবীনকে রাজি করান।

এই ঘটনার পর সাদিয়ার একজন নারী প্রতিবেশী তাকে সাহায্য করতে চান। তিনি নবীনকে ফোন করে নিজেকে নারী ওয়ার্ড সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। কেন সাদিয়ার ওপর নির্যাতন করা হলো তা জানতে চান তিনি। সাদিয়ার রক্তমাখা কাপড় তিনি র‍্যাবের কাছে পাঠিয়েছেন বলে হুমকিও দেন সেই নারী। ফোনে এই আলোচনার পর সাদিয়াদের বাড়িতে নবীন আসেন তাকে নিয়ে যেতে। এ সময় সেই নারী আবার বোরকা পরে ওয়ার্ড সদস্যের অভিনয় করে নবীনকে

বলেন, সাদিয়াকে মারধর করার কারণে তার মায়ের সঙ্গে যেন তিনি বোঝাপড়া করেন। এছাড়াও এমন ঘটনা আর যেন না ঘটে, সে ব্যাপারেও সেই নারী নবীনকে হুঁশিয়ারি দেন।

সাদিয়া অভিযোগ করেন, স্বামীর বাড়িতে থাকা অবস্থায় প্রতিবেশীরা কখনোই তাকে নির্যাতনের সময় উদ্ধার করতে আসতেন না। কারণ সবাই তার শাশুড়িকে ভয় পেতেন। সাদিয়ার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের একজন ইউপি সদস্য একটি সালিশ ডাকেন। কিন্তু সাদিয়ার সঙ্গে তার শাশুড়ির বিবাদ মেটানো সম্ভব হয়নি। সাদিয়া জানান, তার শাশুড়ি একজন নির্লজ্জ ও ভয়ানক নারী। কারণ যদি কোনো পুরুষ তার শাশুড়িকে থামাতে বা শোধরাতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি নিজেই নিজের শরীরের কাপড় খুলে সেই পুরুষের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে আসেন। সাদিয়া জানান, এজন্যই তাকে মারধরের সময় কেউ সাহস পেতেন না এগিয়ে আসতে।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ছাড়াও সাদিয়ার স্বামী ও তার শাশুড়ি তাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেন। সাদিয়ার ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র তার বাবার বাড়ি থেকে পেয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন, তখন তার শাশুড়ি কাপড়চোপড় ফেলে দিয়ে রান্নাবান্নার পাত্র চুরি করতেন। তার নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণের খরচ তাকে দেওয়া হতো না। নির্যাতনের কারণে সাদিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। গবেষক দলের ওপর আস্থা থাকায় তিনি সবকিছু বর্ণনা করেছিলেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর আওতায় সাদিয়ার পক্ষে মামলা দায়ের করা এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে ব্লাস্ট রাজি হয়। দেনমোহরের টাকা এবং সন্তানের ভরণপোষণের টাকা আদায় করার জন্য ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলা দায়ের করা হয়।

সব নির্যাতন সহ্য করেও সাদিয়া সংসার টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এর কারণ নারী হিসেবে সংসার বিষয়ে তার উপলব্ধি। তিনি বিশ্বাস করতেন বাপের বাড়িতে একজন নারীর কোনো অধিকার নেই। একজন নারীর প্রকৃত বাড়ি হলো তার স্বামীর বাড়ি, যা তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন।

> “
> এটা আমার বাড়ি না আপা। আমার বাবার বাড়ি শুধু আমার বাবারই বাড়ি। আমার বাড়ি হলো আমার স্বামীর বাড়ি। যে বাড়ি আমি নিজের জন্য বানিয়েছি সেটাই আমার বাড়ি। আপনি বলুন তো, আমার বাবার বাড়ি কি কখনও আমার নিজের বাড়ি হবে?
>
> —সাদিয়া

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে গবেষক দলের প্রথম ফলোআপের সময় সাদিয়া তার স্বামীর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বলেছিলেন তার স্বামী এসেছিলেন তাকে ও তার সন্তানকে

ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু তিনি শাশুড়ির কারণে ফিরে যেতে ভীত ছিলেন। নবীন সাদিয়ার বাবার বাড়ি এসে কয়েকদিন থেকে গেছেন। এছাড়াও সাদিয়া বলেন তিনি তার স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার স্বামী তা করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে সাদিয়ার স্বামী দাবি করেছেন তিনি সাদিয়াকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাদিয়া ফোনে তাকে হয়রানি করেছেন; তাকে এবং তার মাকে গালিগালাজ করেছেন।

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে সাদিয়া আবার নবীনের সঙ্গে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। এখনও তাকে বেশ বিরক্ত মনে হয়েছে। বিআইজিডির গবেষক দলের সঙ্গে তিনি ফলোআপ মিটিংয়ে রাজি হননি। ব্লাস্টের পটুয়াখালী অফিস এই মামলাকে নিষ্পত্তিকৃত হিসেবে বিবেচনা করে সব অভিযোগ উঠিয়ে নিয়েছে।

উপসংহার

সাদিয়ার ঘটনা একটি উদাহরণ যে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলায় সঠিক আইনি সমাধান পাওয়া কত কঠিন ও হতাশার। তার বাবা ও পুলিশ কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে কোনো লাভ হয়নি, বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এছাড়াও তারা সালিশের ব্যবস্থা করেছিলেন, যদিও তা পুলিশের আইনি কর্তৃত্বের মধ্যে পড়ে না। সহিংসতা বন্ধ, ভরণপোষণের নিশ্চয়তা এবং সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সাদিয়ার জন্য প্রতিকার বয়ে আনবে এমন কোনো ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্লাস্ট ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের আইনি হস্তক্ষেপ সাদিয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এসব হস্তক্ষেপের ফলে পরোক্ষভাবে কিছু প্রভাব পড়েছিল। যেমন এই দম্পতি সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন এবং সাদিয়ার শাশুড়ির কাছ থেকে দূরে গিয়ে একসঙ্গে কিছুদিন বসবাসও করেছেন। সাদিয়ার মতে, সব সমস্যার জন্য দায়ী তার শাশুড়ি।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

তাকে জেলে ভরতে না পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না কমলা

কমলা ও তার সন্তান একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে। তাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার পেতে তারা অপেক্ষা করছে।

ছ. তাকে জেলে ভরতে না পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না —কমলা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

যৌতুক, স্বামীর হাতে শারীরিক নির্যাতন, ফটোশপ করা ছবি, প্রতারণা, শর্তসাপেক্ষে জামিন, শিশু নির্যাতন, সালিশ, আদালত, ব্লাস্ট

ভূমিকা

বরিশালের কমলার বয়স উনিশ বছর। মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর তিনি তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে ক্রমাগত শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন—এমনকি গর্ভবতী থাকা অবস্থায়ও। তার স্বামী ফটোশপ করা ছবি দিয়ে তাকে প্রতারণা করেছেন। এভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন ও সামাজিক মাধ্যমে হয়রানি করা হয়েছে। এছাড়াও তার স্বামী তাদের সন্তানের ভরণপোষণের খরচ দিতে অস্বীকার করেছেন। সারাক্ষণ কমলাকে তিনি যৌতুকের জন্য নির্যাতন করতেন। কমলা তার পুরো ন্যায়বিচারের অভিযাত্রায় মধ্যস্থতা করার জন্য পরিবার, সমাজ, এনজিও এবং আদালতের মতো বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের কাছে গেছেন। তার স্বামীর নাম জীবন। তিনি আদালতের আদেশ অমান্য করেছেন। উল্টো জীবনের পরিবার কমলাকে হয়রানি করতে পুলিশ পাঠিয়েছে। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং কমলা ও তার সতেরো মাস বয়সী শিশুসন্তানকে তার স্বামী নৃশংসভাবে মারধর করেন, তখন কমলা সিদ্ধান্ত নেন আর মধ্যস্থতা নয়—এবার আইনের মাধ্যমে তার স্বামীর সাজা নিশ্চিত করবেন।

বৃত্তান্ত

কমলা তার বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। তার একটি বড় ভাই আছে। কমলা ও তার ছেলে এখন তার বাবা-মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। কমলার ভাই ভাড়ায় গাড়ি চালান। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং কমলার আর্থিক জোগানদাতা। কমলা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

পড়াশোনা করেছেন। এরপর আর পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করেনি তার। কমলার বাবা বেশ বয়স্ক মানুষ। তিনি কাজ করতে সক্ষম নন; কিন্তু কমলার মা এখনও বেশ কর্মঠ। আদালতের ব্যাপারেও তার কিছু জ্ঞান আছে। কারণ আগে জমিসংক্রান্ত বিরোধে তাকে আদালতে যেতে হতো। প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীরা আদালতের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে কমলার মায়ের কাছে আসেন।

কমলার স্বামী জীবনের বয়স ছাব্বিশ বছর। জীবনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী সায়েদখালি বাজারে। ঢাকায় তিনি একটি পিকআপ ভ্যান চালান। তার বাবা-মা গ্রামেই থাকেন। কমলা ও জীবনের পরিচয় ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে। এরপর তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কমলার মতে, জীবন তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। যদিও কমলা বিয়ের আগে কিছুদিন অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তার মনে হয়েছিল পরস্পরকে আরেকটু ভালো করে জানা ও বোঝা প্রয়োজন। জীবন এ ব্যাপারে একগুঁয়ে ছিলেন। কমলাকে ভয় দেখান যে—বিয়ে না করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এই চাপের মুখে কমলা ২০১৮ সালে ষোলো বছর বয়সে জীবনকে বিয়ে করেন। তিন বছর হয়ে গেছে তাদের বিয়ের বয়স।

কেস

বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস ভালোই কেটেছে। দুজনই সুখী ছিলেন। তবে জীবনের আচরণ ধীরে ধীরে বদলে যায়। কমলার মতে, তার শাশুড়ি জীবনকে উসকানি দিতেন। তার শাশুড়ি তাকে গালিগালাজ করতেন। দ্রুতই তা মারধরের পর্যায়ে চলে যায়। জীবন তাকে গর্ভবতী হওয়ার আগে-পরে সব অবস্থায়ই মারধর করেছেন। সন্তানের জন্মের পর সেই সন্তানকেও তিনি মারধর করেছেন।

এছাড়াও তাকে প্রচণ্ড মানসিক নির্যাতন করা হয়। জীবন অন্য নারীদের সঙ্গে ছবি তুলে কমলাকে পাঠিয়ে বলতেন, তিনি আর কমলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন না।

> “
> সে (জীবন) আমাকে বলে, ‘আমি তোর চেয়ে ভালো একজনকে পেয়েছি। আমি যদি তোকে বাজারে বিক্রি করতেও যাই, কেউ তোকে কিনবে না। তুই এখন মা হয়েছিস। বাচ্চার মাকে কেউ কিনবে না।’
>
> —কমলা

তাছাড়া কমলা অর্থনৈতিক সহিংসতারও শিকার হয়েছেন। কারণ তার স্বামী তার ও তাদের সন্তানের কোনো ভরণপোষণ দিতেন না।

কমলার ওপর সকল নির্যাতন শুরু হয় যৌতুকের দাবি থেকে। বিয়ের সময় জীবনের পরিবার দুই লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেছিল। এই টাকা দিতে না পেরে কমলার পরিবার জীবনকে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি সোনার হার দেয়। তারাও কমলাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়েছিল (যেমন: কাপড়চোপড়)। কমলার ভাই বিয়ের জন্য বড় করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পাত্রপক্ষের পঞ্চাশজনকে আপ্যায়ন করেন। এক বছর পর, জীবন ও তার পরিবার কমলাকে আরও যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। জীবন একটি মোটরসাইকেল দাবি করেন। জীবনের বাবা-মা কমলাকে চাপ দেন যেন বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে তাদের জন্য একটি ঘর বানায় (তারা একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন)। যৌতুক ছাড়াও কমলার ভাই তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কমলার ভাই কমলা ও জীবনকে তার কাছে কয়েক মাস রাখেন, যেন তারা কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন।

জীবনকে নিয়ে থাকার জন্য কমলা একটি আলাদা বাসা ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সহিংসতা কমানোর জন্য এটি ছিল তার প্রথম উদ্যোগ। নতুন বাসার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে কমলার মা তাদের সহায়তা করেন। কিন্তু আলাদা থাকলেও সহিংসতা কমেনি। জীবন নিয়মিত মদ-গাঁজা সেবন করতেন। তিনি মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে কমলাকে মারধর করতেন। দ্বিতীয় উদ্যোগ হিসেবে কমলা সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভেবেছিলেন এর ফলে পরিস্থিতি ভালো হবে। জীবন এতে রাজি হন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে কমলা গর্ভবতী হন। কিন্তু কমলার ধারণা ভুল ছিল। গর্ভবতী অবস্থায়ও জীবন তাকে মারধর করেন। জীবনের প্রতিবেশীরা যখন দেখলেন—গর্ভবতী কমলাকে এভাবে মারধর করা হচ্ছে, তখন তারা একটি অনানুষ্ঠানিক সালিশ ডাকেন—যেন জীবন ও তার পরিবারের সদস্যরা সহিংস আচরণ বন্ধ করেন। সালিশকাররা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, জীবনকে অবশ্যই তার গর্ভবতী স্ত্রীকে মারধর বন্ধ করতে হবে। জীবন সেসব সিদ্ধান্ত অমান্য করে কমলাকে মারধর করা চালিয়ে যান।

গর্ভধারণের পাঁচ মাস পর ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কমলাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন জীবন। কিন্তু তার জিনিসপত্র রেখে দেন। কমলা তার মাকে ফোন করে তাকে নিয়ে যেতে বলেন। তার মা তাদের গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে এসে কমলাকে বাড়ি নিয়ে যান।

কমলা তার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি জীবনকে ফোন করে তাকে নিয়ে যেতে বলতেন। কিন্তু জীবন এতে রাজি হতেন না। কমলা তার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন (এমনকি চাচি শাশুড়ির সঙ্গেও)। কিন্তু তারা কমলা ও তার মাকে শ্বশুরবাড়ির লোকদের খুশি করতে না পারার জন্য দোষারোপ করেন।

কমলা ও তার মা সমঝোতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। তারা জীবনদের গ্রামের ইউপি চেয়ারম্যান সেলিমের কাছেও যান সাহায্যের জন্য। তারা ভেবেছিলেন সালিশ ডাকলে জীবন রাজি হবে কমলাকে ফিরিয়ে নিতে। চেয়ারম্যান সেলিম তাদের অনুরোধে একটি সালিশ ডাকেন। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কমলা ও তার মা চেয়ারম্যানের কাজে খুশি হতে পারেননি। কমলার মায়ের মতে, চেয়ারম্যান নিজে যেহেতু একজন পুরুষ, তাই তিনি কমলার কষ্ট বুঝবেন না। এছাড়াও তার মা অভিযোগ করেন সালিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং সালিশকাররা আসলে টাকা ছাড়া কিছু বোঝেন না।

“

সালিশকাররা টাকা নেন। শুধু নারীরাই নারীদের কষ্ট বুঝতে পারেন। পুরুষরা কি বুঝতে পারেন? তারা নারীদের দুর্দশা বুঝতে পারেন না। পুরুষ ও ছেলেরা [তা বুঝতে পারে না]।

—কমলার মা

২০১৯ সালের জুলাই মাসে কমলার ছেলে হয়। জীবন তখন ঢাকায় থাকতেন তার বাবা-মায়ের সঙ্গে। সন্তানের জন্মের সময় তিনি আসেননি। এমনকি হাসপাতালের খরচও দিতে রাজি হননি। কমলার ভাই চিকিৎসার সব খরচ বহন করেন। ছেলে জন্ম নেওয়ার তিন দিন পর জীবন তাকে দেখতে আসেন। কিন্তু দেখা শেষ করেই দ্রুত চলে যান।

তখনও কমলা তার সন্তানসহ স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন পিতৃহীন সন্তান লালনপালন করা খুবই কঠিন হবে, কারণ তা সামাজিক ও আর্থিকভাবে কঠিন। কমলা এবং তার মা আরেকটি সালিশ ডাকতে চেয়ারম্যান সেলিমের কাছে যান। সন্তান জন্মের দুই মাস পর চেয়ারম্যান দ্বিতীয়বার আরেকটি সালিশ ডাকেন। চেয়ারম্যান চেয়েছিলেন যে কোনো মূল্যে কমলার বিয়ে টিকিয়ে রাখতে।

“

যদি কোনো নারী তার স্বামীকে হারান, তিনি তার সম্মান হারিয়ে নির্লজ্জ হয়ে পড়েন। তিনি যদি তালাকপ্রাপ্ত হন, তাহলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি তখন চাইলে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসেও কাজ করতে পারেন। অন্য পেশায় যুক্ত হতে পারেন। যদি তার প্রথম বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তার মানবতা ও সম্মান অর্ধেক হয়ে যায়।

—ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম

সালিশের সময় ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম জীবনকে দুই দিনের জন্য কমলার বাবার বাড়িতে থাকতে বলেন, যেন তারা নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। এরপর কমলাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন সেলিম। কমলা তার সন্তানসহ শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান। সালিশে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সন্তানের আগমন উপলক্ষে জীবনের গ্রামে একটি অনুষ্ঠান করা হবে। এবার জীবনের পরিবার কমলার পরিবারের কাছে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের শর্ত হিসেবে গরু দাবি করে। তবে কমলার পরিবারের তা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। সে কারণে জীবন রেগে যান। আবার তিনি কমলাকে মারধর শুরু করেন। এরপর কমলা ও তার সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। কমলার সব জিনিসপত্র রেখে দেন জীবন। কমলা আবার বাবার বাড়ি ফিরে আসেন।

ইতোমধ্যে জীবন ও তার পরিবার কমলার পরিবারকে হয়রানি করার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে। তারা তিনজন সাংবাদিককে পাঠান কমলাদের বাড়িতে। জীবন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন—কমলার বাবা-মা কমলা ও তার সন্তানকে শ্বশুরবাড়ি আসতে দিচ্ছেন না। জীবন তার স্ত্রী-সন্তানকে ফেরত পেতে সহযোগিতার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। কমলার মা তখন সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করেন যে, এটি আসলে তাদের হয়রানি করার জন্য করা হচ্ছে। সাংবাদিকরাও বুঝতে পারেন কমলা ও তার পরিবার এখানে নির্দোষ।

কমলা যখন বুঝতে পারলেন একের পর এক সালিশ কোনো কাজে দিচ্ছে না, তখন তিনি আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আইনি প্রক্রিয়ার টাকা জোগাড় করা নিয়ে তার মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল। সমাজে ব্লাস্টের সুনাম থাকায় তিনি এই সংস্থার নাম জানতেন। তিনি জানতেন ব্লাস্ট দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। তিনি তখন ভাবলেন তাদের যেহেতু সামর্থ্য নেই, তাই ব্লাস্ট সবচেয়ে ভালো উপায়। জমিসংক্রান্ত বিরোধে এর আগে আদালতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল কমলার মায়ের। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শেষ পর্যন্ত কমলাকে নিয়ে ব্লাস্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ব্লাস্ট আবেদন গ্রহণ করে জীবন ও তার পরিবারকে দুটি নোটিশ পাঠায়। সমঝোতার জন্য তাদের ডাকা হয়। কিন্তু তারা হাজির হননি। এরপর ব্লাস্ট কমলার পক্ষ হয়ে প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে ২০১৮ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ নম্বর ধারার আওতায় জীবনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। কমলার আদালত ও যাতায়াতের যাবতীয় খরচ ব্লাস্ট বহন করে।

আদালত থেকে নোটিশ পাওয়ার পর জীবন হাজির হন। কমলাকে ফিরিয়ে নেওয়ার শর্তে তিনি জামিন পান। শর্তের মধ্যে ছিল– জীবন কমলাকে ফিরিয়ে নেবেন, স্ত্রী হিসেবে তাকে প্রাপ্য সম্মান দেবেন এবং স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করবেন। কিন্তু ন্যায়বিচারের জন্য কমলার আকুতির চেয়ে বিচারব্যবস্থার ফাঁকফোকর বেশি বড় প্রমাণিত হয়। কারণ কারাদণ্ড এড়াতেই

জীবন এই কৌশল নিয়েছিলেন। আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়ার পরপরই তিনি কমলাকে ফেলে নিজ গ্রামে চলে যান।

এসব ঘটনায় হতাশ হয়ে কমলা আবার সালিশের আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ইউপি চেয়ারম্যান সেলিমের কাছে যান। চেয়ারম্যান কমলার পরিবারকে কমলার শ্বশুরবাড়ির লোকদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলেন। জীবনের পরিবারকেও কমলার বাবার বাড়ি গিয়ে সব বিষয় সমাধান করে কমলাকে নিয়ে আসতে বলেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী জীবন তার পরিবার ও কিছু আত্মীয়স্বজন নিয়ে কমলাদের বাড়ি যান তাকে ফিরিয়ে আনতে। কমলার পরিবার তাদের বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে। কিন্তু জীবন আবার কমলাকে ফিরিয়ে নেওয়ার শর্ত হিসেবে মোটরসাইকেল দাবি করেন। কমলার মা জানান তাদের সেই সামর্থ্য নেই, তাই দিতে পারবেন না। জীবন এরপর আবার সহিংস হয়ে ওঠেন। সবার সামনেই তিনি কমলাকে সেখানেই মারধর করতে থাকেন। জীবন কোদাল দিয়ে আঘাত করলে কমলা মারাত্মকভাবে আহত হন। জীবনের পরিবারের সদস্যরা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। তারা বলতে থাকেন যে কমলার ছেলে জীবনের সম্পত্তি দাবি করবে ভবিষ্যতে। কমলার মামলা শক্তিশালী হওয়ার পেছনে এই সন্তানের দায় আছে বলে তারা কমলার ছেলেকে দোষারোপ করেন (যেহেতু শিশুটি জীবনের উত্তরাধিকার)। এর ফলে জীবন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তার ছেলেকেও মারধর শুরু করেন। সে সময় শিশুটির বয়স ছিল মাত্র দেড় বছর।

মারাত্মক আহত হওয়ায় কমলা ও তার ছেলেকে পাশের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কমলা মাথায় আঘাত পান। মাথা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। তার ছেলের কাঁধের হাড় নড়ে যায়। তবে কমলা করোনা অতিমারির ভয় ও তার ছেলের ঝুঁকির কথা ভেবে হাসপাতালে ভর্তি হতে রাজি হননি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দেন কমলা যদি ভর্তি না হন, তাহলে তা ভুল হবে কারণ তার আঘাত গুরুতর। তারা কমলা ও তার মাকে হামলার দায়ে ফৌজদারি মামলা করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তারা মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই ওষুধপত্র লিখে দেন। হাসপাতাল থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, কমলার মামলার জন্য যে ধরনের মেডিকেল কাগজপত্র লাগবে, তা সরবরাহ করা হবে।

এবার যেহেতু গুরুতর আঘাত পেয়েছেন কমলা, তাই তিনি আইনি পদক্ষেপ নিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি আবার ব্লাস্ট অফিসে যান। এবার তিনি স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য সাহায্য চাইতে আসেননি। এর পরিবর্তে তাকে ও তার সন্তানকে আঘাত করার দায়ে তার স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে আসেন। ব্লাস্ট তার অভিযোগটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠায়। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী, কমলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় জীবনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জীবন কমলার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার ব্যবস্থা করেন। জীবন পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, কমলার বাবা-মা তার স্ত্রী-সন্তানকে জোরপূর্বক আটকে রেখেছেন। জীবনের

কৌশল ছিল এর মাধ্যমে কমলার পরিবারকে চাপ দিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া। কমলাদের বাড়িতে পুলিশ আসে। কিন্তু তারা কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। কারণ পুলিশ এসে দেখে বুঝতে পারে জীবনের অভিযোগ ভুয়া। তবে জানা যায় কমলা পুলিশকে পাঁচশ টাকা দিয়েছিল।

জীবনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা চলাকালে কমলা ছেলেসহ তার বাবার বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু তখনও জীবন কমলাকে হয়রানি বন্ধ করেননি। জীবন কমলার ফোনে অন্য নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ছবি পাঠাতেন এবং বলতেন কমলাকে তিনি তালাক দিতে চান। কারণ তিনি আরেকজনকে বিয়ে করবেন। কমলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ আর নেই। মানুষের মুখে কমলা শুনেছেন জীবন আবার বিয়ে করেছেন। এছাড়াও জীবন এমনভাবে কমলার ছবি ফটোশপ করেন যেন বোঝা যায় একাধিক লোকের সঙ্গে কমলা পরকীয়া করছেন। এভাবে কমলাকে হয়রানি করা হয়। এসব ছবি সে ইমো নামের একটি যোগাযোগ অ্যাপে পাঠাতেন। তিনি কমলাকে হুমকি দেন এগুলো আদালতে দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ দুর্বল করে ফেলবেন। এভাবে তিনি কমলাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করেন।

বর্তমানে কমলার দায়ের করা দুইটি মামলাই চলমান রয়েছে। তদন্ত চলমান থাকা যৌতুকের মামলায় জীবন আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় মামলাটি এখনও শুরু হয়নি। দ্বিতীয় দফায় লকডাউন থাকায় যৌতুকের মামলা বিলম্ব হয়—কারণ আদালত বন্ধ ছিল। করোনা অতিমারির কারণে মামলা বিলম্বিত হওয়ায় কমলা অনিশ্চয়তার কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়েন।

জীবন এখনও সন্তানের ভরণপোষণের খরচ দিচ্ছেন না। তিনি আবার বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একটি সন্তানও জন্ম নিয়েছে। তারা সবাই ঢাকায় থাকেন। জীবনের দ্বিতীয় বিয়ের আগে কমলাকে তিনি কোনো নোটিশ পাঠাননি। কমলা জানতে পেরেছেন কারণ জীবন এখনও নতুন স্ত্রী ও সেই স্ত্রীর সঙ্গে তার সন্তানের ছবি পাঠান কমলাকে। এসব কমলার ওপর মানসিক প্রভাব ফেলে। কমলা ও তার মা জীবনের পাঠানো সব ছবি রেখে দিয়েছেন। এছাড়াও তারা জীবনের সঙ্গে ফোনের কথাবার্তা রেকর্ড করে রেখেছেন, যেখানে জীবনের চিৎকার ও তার দেওয়া হুমকির কথা শোনা যায় (আইনি ভাষ্য ১২ দেখুন)। কমলা ও তার মায়ের ধারণা এগুলো জীবনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের মামলাকে আরও শক্তিশালী করবে।

আইনি ভাষ্য ১২

স্ত্রীকে যদি তার স্বামী হুমকি দেন, তাহলে তিনি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে রাখতে পারেন (ফৌজদারি বিধিমালার ১৫৪ ও ১৫৫ ধারায়)। কিন্তু কোনো মামলা চলাকালে যদি কোনো স্বামী বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে তার স্ত্রীকে হুমকিস্বরূপ ভিডিও বা রেকর্ডিং পাঠান, তাহলে স্ত্রী তা নিজের আইনজীবীকে জানাবেন (কিংবা ফৌজদারি মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটরকে)। একই আইনে তখন আইনজীবী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে ভিডিওতে যদি প্রত্যক্ষ কোনো ক্ষতির হুমকি না থাকে, কিন্তু তবুও তা অপমানজনক বা হয়রানিমূলক হয় (যেমন: গালিগালাজ), তাহলে বিষয়টিকে পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

এই মামলায়, যদিও কমলা ছবি ও ভিডিওগুলোকে হয়রানি হিসেবে দেখছেন, কিন্তু বিজ্ঞ আইনজীবীর ধারণা এগুলো মাননীয় আদালত বিবেচনায় নেবেন না। আর তাই কমলা ও তার মা এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট।

উপসংহার

কমলার ঘটনা থেকে সহিংসতার শিকার নারীর ন্যায়বিচারের অভিযাত্রার জটিল পথপরিক্রমা দেখা যায়। তিনি ক্রমাগত তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার প্রতিবেশী, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তার নিজের পরিবার কমলার সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারে কমলার প্রত্যাশা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে। শুরুতে তিনি চেয়েছিলেন নিজের সংসারে ফিরে যেতে। এতসব নির্যাতন সত্ত্বেও নিজের স্বামীর সঙ্গে সংসারজীবন চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। নিজের সন্তান জন্মের পরেও ফিরে যেতে চেয়েছিলেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। কিন্তু জীবন যখন তাকে ও তার সন্তানকে মারাত্মক আঘাতে শারীরিকভাবে আহত করে, তখন চূড়ান্তভাবে কমলার বিচার প্রত্যাশা পাল্টে যায়। তিনি আর জীবনের ঘরে ফিরে যেতে চান না। বরং তিনি চান তার স্বামীকে জেলে ঢোকানো হোক। তবে তিনি তার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কারণ আর্থিক ও সামাজিকভাবে বাবা ছাড়া সন্তান লালনপালন করা খুবই কঠিন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় করা দুটি মামলাই চলমান রয়েছে। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে বিলম্বিত হওয়ায় কমলা এ ব্যাপারে শঙ্কিত।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

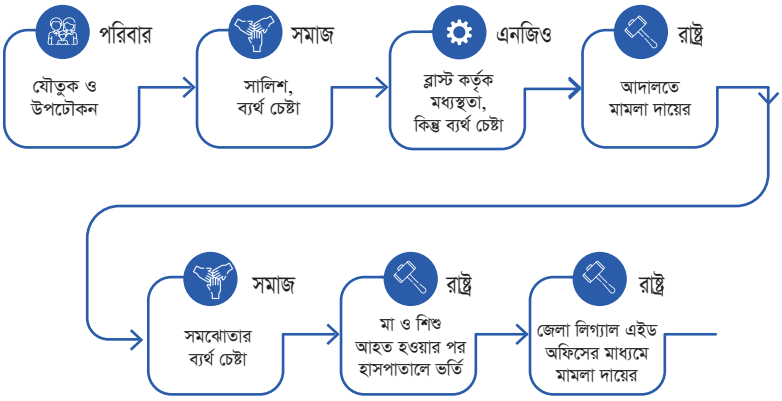

ভুলে যেতে ও ক্ষমা করে দিতে প্রতারণা রূপা

ব্র্যাকের এইচআরএলএসের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে রূপা আইনি সহায়তা নিচ্ছেন, যিনি আদালতে রূপার পক্ষে মামলা লড়ার জন্য নিযুক্ত একজন প্যানেল আইনজীবী ।

জ. ভুলে যেতে ও ক্ষমা করে দিতে প্রতারণা: রূপা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

প্রেমের বিয়ে, ব্র্যাকের এইচআরএলএস, হাসপাতাল, মধ্যস্থতা, পোশাক শ্রমিক, আবেগীয় প্রতারণা, পুলিশ, সাংবাদিক, হলফনামা, সমঝোতা চুক্তি

ভূমিকা

রূপার বাড়ি ময়মনসিংহে। বাইশ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। আশিকের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০১৯ সালে তারা আদালতে বিয়ে করেন। গাজীপুরে কাজ করার সময় রূপার নিজের উপার্জনের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাকে একদিকে নির্যাতন করা হতো, অন্যদিকে তার স্বামী পরকীয়াও করতেন। রূপাকে তার স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে নিতে আশিকের পরিবার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে এবং সালিশ ডাকে। কিছুদিন পরই রূপাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় ব্র্যাকের এইচআরএলএসের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় আশিক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আশিকের পরিবারের পক্ষে স্থানীয় লোকজন মামলা তুলে নিতে রূপার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাকে ধোঁকা দিয়ে একটি হলফনামায় সই করানো হয়, যেখানে লেখা ছিল তিনি তালাক চান। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে রূপার তালাক হয়। আশিক এরপর আরেকটি বিয়ে করেছেন। রূপা এখন আশিকের শাস্তি চান। আদালতে হাজির হয়ে বলতে চান, তাকে জোর করে সমঝোতা চুক্তিতে সই করানো হয়েছিল।

বৃত্তান্ত

রূপার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কেরানি আর মা গৃহিণী। তার বড় তিন ভাই রয়েছে। তার ভাইয়েরাও শিক্ষিত। তাদের একটি ইটভাটা আছে। অর্থাৎ রূপাদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল। তার খালা খাইরুন বেগম দশ বছর ধরে ইউপি সদস্য। রূপা ভুয়াগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে ব্যাচেলর ডিগ্রিতে পড়াশোনা করছিলেন।

আশিকের বয়স ছাব্বিশ বছর। রূপাকে বিয়ে করার সময় তিনি একটি কারখানায় কাজ করতেন। বর্তমানে বেকার। আশিকের বাবা কৃষিকাজ করেন। তার পরিবার রূপার পরিবারের মতো অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয়। আশিকের তিন ভাই ও দুই বোন আছে। ভাইবোনদের মধ্যে আশিকই একমাত্র মাস্টার্স পাস করেছেন।

কেস

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রূপা ও আশিকের চেনাজানা। রূপা যখন ডিগ্রিতে ভর্তি হন, তখন তাদের সম্পর্ক শুরু। আশিকও একই কলেজে পড়তেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তারা গোপনে আদালতে বিয়ে করেন। কেউই পরিবারকে জানাননি। বিয়ের একমাস পর ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বিয়ের বিষয়টি পরিবারকে জানাতে রূপা আশিককে চাপ দেন। আশিকের এক ভাইয়ের কাছে রূপা বিয়ের কথা বলে দেন। রূপার পরিবার মেনে নিলেও আশিকের বাবা বিয়ে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কারণ আশিকের বাবা আশা করেছিলেন, শিক্ষিত ছেলে বিয়ে করিয়ে বড় অঙ্কের যৌতুক আদায় করবেন। কিন্তু এই বিয়েতে কোনো যৌতুক নেওয়া হয়নি। ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ রূপাদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে সময় দুই লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়।

বিয়ের প্রথম ছয় মাস ভালোই কাটে। শ্বশুরবাড়িতে আশিকসহ অন্য সবার সঙ্গেই রূপা ছিলেন। তবে সে সময় আশিকের কোনো চাকরি ছিল না। পরবর্তীকালে, বিয়ের সময়ে নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য আশিকের বাবা আশিককে চাপ দেন।

আশিক একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নেন। রূপা বাপের বাড়ি থেকে কিছু টাকা এনে এবং গহনা বিক্রি করে ঋণের একটি অংশ পরিশোধ করেন। কিন্তু রূপা তার পরিবারকে বিষয়টি জানাননি। গহনা বিক্রি করেও পুরো ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এরপর রূপা আর কোনো পথ না পেয়ে তার পরিবারকে বিষয়টি জানান। রূপার পরিবার পরামর্শ দেয় যে রূপা ও আশিক দুইজনেরই চাকরি করা উচিত। তখন দুইজনই গাজীপুরে চাকরি শুরু করেন। তারা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। অন্যরাও থাকতেন সে বাসায়। ঋণ পরিশোধ করতে সেখানে এগারো মাস কাজ করেন রূপা। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রূপা বেতন গ্রহণ করতেন। বিয়ের পর আশিক রূপাকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দিতেন না। তাই আশিক নিজেই রূপার বেতন তুলতেন। রূপাকে না বলেই তিনি টাকা খরচ করতেন।

এছাড়াও ব্যাংকে রূপার একটি ডিপিএস ছিল। রূপার পরিবার তার বিয়ের জন্য এই টাকা জমিয়েছিল। শুরুতে আশিক এই টাকা দিয়ে কিছু করতে আগ্রহ দেখাননি। পরে যখন রূপা তার গহনা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দেন, তখন আশিক টাকা চাইতে শুরু করেন। কারণ তিনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করতে চাইছিলেন। রূপা বুঝতে পারলেন আর কোনো পথ নেই কারণ আশিক ক্রমাগত তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছিলেন। এ সময় রূপা আশিকের চাচার কাছে

টাকা দেন। সেই চাচা আশিকের পক্ষ হয়ে টাকা গ্রহণ করেন। রূপার খালা ছিলেন ইউপি সদস্য। সাক্ষী হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরে থাকার সময় রূপা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন আশিকের আরেকটি সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে যখন রূপা আশিককে জিজ্ঞেস করেন, তখন তাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে আশিক রূপার পায়ে ভাতের মাড় ঢেলে দেন। রূপাদের বাড়িওয়ালা সহিংসতার বিষয়টি জানতেন। তিনি রূপাকে জিজ্ঞেস করেন, রূপা কতদিন এভাবে সহ্য করবেন! তিনি রূপাকে বুঝিয়ে বলেন যদি একজন পুরুষ বোঝার চেষ্টা না করেন, তাহলে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে লাভ নেই। এরপর বাড়িওয়ালা তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে রূপার বাবাকে এসব বিষয় জানান। বাড়িওয়ালা রূপার বাবাকে বলেন,

“

যদি আপনি নিজের মেয়েকে জীবিত দেখতে চান, তাহলে তাকে আপনার কাছে নিয়ে যান। তা না হলে আশিক আপনার মেয়েকে মেরে ফেলবে।

রূপার বাবা এরপর তার ছেলেকে পাঠান রূপাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। রূপার ভাই তাকে বলেন,

“

চাকরি আর করতে হবে না। তুই আয়রোজগার করে তার দেখাশোনা করেছিস। তোর দিক থেকে অনেক করেছিস। কিন্তু তোর প্রতি ওর আর কোনো মায়াদয়া নেই।

রূপার বড় ভাই গাজীপুর থেকে তাকে নিয়ে আসার পর আশিকের কাছে ফিরতে রূপা জোরাজুরি করেন। এ কারণে রূপার পরিবার একটি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশিকের বাবা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। রূপা বিশ্বাস করতেন তার শ্বশুর যা বলবেন, আশিক তা-ই মানবেন।

রূপার বড় ভাই আশিকের বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু আশিকের বাবা সমঝোতায় কোনো আগ্রহ দেখাননি। এর পরিবর্তে আশিকের বাবা বলেন, রূপা দেনমোহর বাবদ আশি-নব্বই হাজার টাকা নিয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে তালাকে রাজি হয়ে যাক। তিনি এ-ও জানান, আশিকদের পরিবারে পুরুষদের একাধিক বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু রূপার ভাই জানান, তার বোন তালাক নয়, সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়।

“

আমি তার তালাক চাচ্ছি না। আমি চাই তার সংসার টিকে থাকুক।

—রূপার বড় ভাই

২০২০ সালের আগস্ট মাসে বাড়ি ফিরে আসার পর রূপা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। সে সময় পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) রুমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রূপা তাকে জানান তিনি সংসার টিকিয়ে রাখতে চান। তিনি এসআই রুমাকে বলেন,

> “ম্যাডাম, আমি আমার সংসার টিকিয়ে রাখতে চাই। আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাই না। এসআই বলেন, তোমার বিয়ে যাতে টিকে থাকে তা নিশ্চিত করতে আমরা পুলিশ পাঠাব। আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা প্রেম করে বিয়ে করেছ। এরপর আমি কেঁদেছিলাম এই বলে যে, এসআই রুমা না থাকলে আমার বিয়ে ভাঙত না।

পুলিশ বেশ কয়েকবার রূপার শ্বশুরবাড়িতে যায়। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। আশিকের পরিবার শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতার জন্য থানায় হাজির হয়। এসআই তখন আশিককে বলেন, তিনি যদি রূপার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন, তাহলে রূপাও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। তবে রূপার ব্যবহার নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ ছিল না। যখন এসআই রুমা আশিককে জিজ্ঞেস করেন তিনি সংসার করতে চান কি-না, তখন আশিক কিছুদিন চিন্তা করার সময় চান। কিন্তু কোনো উত্তর দেননি। ২০২০ সালের ২৮ আগস্ট রূপার পরিবার মধ্যস্থতার একটি উদ্যোগ নেয়। ইউপি সদস্য রূপার খালা, আশিকের প্রতিবেশী মতিন, একজন স্থানীয় মাতব্বর, রূপার দুলাভাই, রূপার ভাই, বাবা ও আশিক সালিশে উপস্থিত ছিলেন। আশিকের পরিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দশ দিন সময় চায়, কিন্তু তারা আর কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি।

রূপার খালা খাইরুন বেগম সমাধানের আশায় তার বাড়িতে তিনটি সালিশ আয়োজন করেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল, এত নির্যাতনের পর রূপাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো ঠিক হবে না। তিনি আরও মনে করেন আশিক অমানবিক। তিনি আশিককে জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে আশিক রূপাকে আরেকবার নির্যাতন করলে তিনি আশিককে ছাড়বেন না।

রূপার ভাইও রূপাকে তার স্বামীর সঙ্গে কোনো ধরনের বোঝাপড়া করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে আশিক রূপাকে ফোন করে বলেন, সবকিছু ভুলে রূপা যেন শ্বশুরবাড়ি চলে আসেন। ২০২০ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বলে রূপা শ্বশুরবাড়ি চলে যান, সঙ্গে দশ হাজার টাকাও নিয়ে যান। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পৌঁছানোর পর তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ ও দেবর মিলে তাকে নৃশংসভাবে পেটায়। তাকে থাপ্পড়-ঘুসি মারা হয়। পেনসিলের কম্পাস দিয়ে তার জিহ্বা ছিদ্র করে দেওয়া হয়, দাঁত ভেঙে দেওয়া হয় এবং তার ননদ ব্লেড দিয়ে তার পায়ের রগ কাটার চেষ্টা করে। রূপাকে এতই নৃশংসভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয় যে—তিনি তিন ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আশিকের এলাকার একজন ওয়ার্ড সদস্য তাকে হুমকি দেন। শ্বশুরবাড়িতে রূপার ফিরে আসাকে ওই ওয়ার্ড সদস্য সন্দেহের চোখে দেখেন। রূপা বলেন,

“

ওয়ার্ড সদস্য এসে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেন, ‘তোমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছেন? তোমাকে কে পাঠিয়েছেন?’ আমি বললাম, ‘আমাকে কেউ পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি।’ এরপর তিনি বলেন, ‘এটা একটা ষড়যন্ত্র, তোমাকে কেউ পাঠিয়েছেন।’ এরপর সেই সদস্য এই বলে হুমকি দেন যে, এক্ষুনি তিনি আমার হাত-পা ভেঙে ফেলবেন।

পরে আশিকের একজন প্রতিবেশীকে দিয়ে রূপাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রূপা তার খালার বাসায় চলে যান। খাইরুন বেগম রূপাকে আশ্রয় দেন। রূপা ভয় পাচ্ছিলেন যে নিষেধ অমান্য করায় তার বড় ভাই তার ওপর ক্ষিপ্ত হবেন। প্রথমে রূপা তার আঘাতের মাত্রা স্বীকার করতে চাননি। পরে যখন রূপাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তখন ডাক্তার নিশ্চিত করেন মামলা করতে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র দেওয়া হবে। ডাক্তার তার কর্মঘণ্টার বাইরেও রূপাকে এসে দেখে যেতেন। দাঁতের ডাক্তারও রূপার দাঁত ভেঙে ফেলার ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেন। খাইরুন বেগম তার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাংবাদিকদের খবর দেন। একজন সাংবাদিক খাইরুন বেগমের সহপাঠী ছিলেন। রূপার ওপর চালানো সহিংসতার ব্যাপারে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলেও খবর সম্প্রচারিত হয়।

সে সময় রূপার বড় ভাই এবং তার বাবার চাচাতো ভাই থানায় মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তদন্ত বিলম্বিত হয়। পরে মামলাটি এসআই রুমার কাছে যাওয়ার তিন দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়। কারণ এসআই রুমার কাছে প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র ও প্রমাণ ছিল। গাজীপুরে রূপার বাড়িওয়ালাও পুলিশের কাছে বিবৃতি দেন। হাসপাতাল থেকে মেডিকেল সনদ নিয়ে এসআই রুমা চার্জশিট প্রস্তুত করেছিলেন। এসআই রুমার ভূমিকায় রূপা সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এতসব সহিংসতা তার ওপর চালানোর পরও তার স্বামী গ্রেপ্তার না হওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ইতোমধ্যে ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর জারা নামের ব্র্যাক এইচআরএলএসের একজন কর্মকর্তা রূপার মামলার খবর পান। আরেকটি ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জারা রূপার ঘটনাটি থানার মুন্সির কাছ থেকে জানতে পারেন। থানার মুন্সির সঙ্গে জারার যোগাযোগ ছিল। জারা তখন আইনি সহায়তা দিতে রূপার কাছে যান। ২০২০ সালের ২৭ অক্টোবর রূপা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আইনি সহায়তা পেতে ব্র্যাক এইচআরএলএসের অফিসে যান। এরপর ব্র্যাক এইচআরএলএস একজন প্যানেল আইনজীবী নিযুক্ত করে এবং মামলার শুনানির ওপর নজর রাখা অব্যাহত থাকে। রূপা জানতেন না যে—ব্র্যাক আইনি সেবা দিয়ে থাকে। তিনি শুধু জানতেন ব্র্যাক থেকে শুধু ঋণ নেওয়া যায়, আর তাদের স্কুল রয়েছে। যদি জানতেন, তাহলে আরও আগেই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্র্যাকে যেতেন।

এইচআরএলএসের প্যানেল আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিজান ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় চারজনকে

অভিযুক্ত করা হয়—রূপার স্বামী, শ্বশুর, ননদ ও দেবর। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় অভিযুক্তদের মধ্যে শেষের তিনজন জামিনে ছিলেন।

আশিকের পরিবার মতিন নামের একজন মাতব্বরের মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে চায়। আশিকের পরিবারের জন্য পুরো বিষয়টি খুবই ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল। প্রতিবার পুলিশ এলে টাকা দিতে হতো—যেন আশিককে গ্রেপ্তার করা না হয়। রূপার ভাই পুলিশকে টাকা দিয়েছিলেন আশিককে গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্তু তারা গ্রেপ্তার করেননি, কারণ আশিকের পরিবার গ্রেপ্তার এড়াতে আরও মোটা অঙ্কের টাকা দেয় পুলিশকে। পুলিশি ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের অনুরোধ নিয়ে আশিক রূপার কাছে যান।

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে মতিন মাতব্বর একটি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করেন। সেখানে মতিন মাতব্বর নিজে, তার শ্যালক, আশিকের ভাই এবং রূপার ভাই উপস্থিত ছিলেন। আশিকের পরিবার রূপাকে দুই লাখ টাকা দিয়ে তালাকের ব্যবস্থা করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও রূপা মামলা তুলে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এসব শর্ত মানার পর, রূপার পরিবার ও আশিকের পরিবার একজন ব্যক্তিগত আইনজীবী নিযুক্ত করে (ব্র্যাকের আইনজীবী নন)। সেই আইনজীবী চুক্তিপত্র তৈরি করে দেন। আশিক, স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং মাতব্বর রূপাকে পরামর্শ দেন—যেন এই বিষয়টি ব্র্যাকের কাছে গোপন রাখা হয়। এটিও চুক্তির একটি শর্ত ছিল। কিন্তু রূপা তালাক চাননি, তিনি শুধু চেয়েছিলেন তার স্বামীকে শাস্তি দিতে। রূপা সাক্ষাৎকারে বলেন,

> “আইনজীবী আমাকে বলেননি যে তালাক দিতে হবে। তিনি বাসায় আমাকে বলেছিলেন আপসনামায় সই করতে। যদি তালাকনামায় সই করার কথা বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি আদালতে যেতাম না।

এইচআরএলএসকে না জানিয়ে এই আপসনামা সই করা হয়। কারণ স্থানীয় মাতব্বর মতিন দুই পক্ষকেই বোঝান যে বিষয়টি ব্র্যাকের কাছে গোপন রাখলে উভয়েরই লাভ হবে। কিন্তু ব্র্যাকের এইচআরএলএস অফিস আপসনামার কথা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হয়। রূপা দাবি করেন তার কাছে আপসনামার কোনো কপি নেই (আইনি ভাষ্য ১৩ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৩

এক্ষেত্রে, যখন দুই পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছায়, তখন আপসনামার কপি দুই পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীদের কাছে থাকতে হবে। তবে যদি মামলার নথিসহ আপসনামা আদালতে জমা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু বাদীর (স্ত্রী) কাছে কোনো কপি না থাকে, তাহলে তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে জমা দেওয়া আপসনামার একটি সত্যায়িত কপির জন্য আদালতে আবেদন করতে পারবেন। তবে এটি সম্ভব যদি আপসনামা আদালতে গৃহীত হয়ে থাকে (বিধি ২৪৩, ফৌজদারি বিধি ও আদেশ ২০০৯)। তাছাড়া আপসনামা যদি স্বামীর আইনজীবীর জিম্মায় থাকে, তবুও স্ত্রী সেই কপি চাইতে পারবেন।

রূপা ও তার পরিবার মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চূড়ান্ত ফলাফলে রূপা সন্তুষ্ট ছিলেন না। খাইরুন বেগম বলেন,

“

না, পুরো প্রক্রিয়াটি সঠিক ছিল না। রূপা ন্যায়বিচার পায়নি। ছেলেটির শাস্তি হওয়া দরকার ছিল।

রূপা বলেন, তিনি সমঝোতা চাননি। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, সাংবাদিকরা এবং মাতব্বর তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তারা সবাই তাকে মামলার পরিবর্তে আপসনামায় সই করতে পরামর্শ দেন। ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর সই করা একটি হলফনামা আছে রূপার কাছে। জেলা সরকারি নোটারিতে এই হলফনামা সই করা হয়, যেখানে বলা আছে, রূপা আশিককে তালাক দিয়েছেন এবং দেনমোহরসহ ভরণপোষণের টাকা বুঝে পেয়েছেন (আইনি ভাষ্য ১৪ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৪

হলফনামা হলো একটি বিবৃতি, যেখানে একজন ব্যক্তি আদালত বা নোটারি পাবলিকে হাজির হয়ে শপথ নিয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন, বা বিয়ে অব্যাহত রাখতে চান না মর্মে ঘোষণা দেন। এই হলফনামা তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে না—কারণ তালাকের প্রক্রিয়া সংবিধিবদ্ধ আইনে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তালাকের উদ্দেশ্যে হলফনামায় সে প্রক্রিয়া বর্ণিত নয় (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ৭)। যেমন– তালাক উচ্চারণ করে সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং নিজের স্ত্রীকে নোটিশ দিয়ে তালাকের প্রক্রিয়া শুরু করা যায় অথবা বিয়ে ভেঙে দিতে মামলা দায়ের করেও করা যায়। তালাকের জন্য হলফনামা কোনো শর্ত নয় এবং তা করার অনুমতিও নেই, যেহেতু বর্ণিত আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী সব সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। তবে প্রাসঙ্গিক মামলায় আপসনামার প্রামাণিক মূল্য রয়েছে।

ব্র্যাক এইচআরএলএসের কর্মকর্তা জারার মতে, আশিকের পরিবারের কাছে রূপা চার লাখ টাকা পাবেন। দুই লাখ টাকা হলো দেনমোহর যা কাবিননামায় উল্লেখ করা আছে। আর দুই লাখ টাকা হলো যৌতুক হিসেবে রূপার ব্যাংকের ডিপিএস থেকে আশিক যে টাকা নিয়েছেন। তবে আশিক ও তার পরিবার শুধু রূপার ব্যাংকের জমানো টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা তারা অবৈধভাবে যৌতুক হিসেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু রূপার পাওনা দেনমোহরের টাকা দেওয়ার কথা বলেননি।

রূপা বলেন, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের বাড়িতে সাংবাদিক পাঠিয়ে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাকে বলা হয়, রূপা যদি আদালতে এই মামলা নিয়ে যেতে চান—তাহলে তাকে সব মানুষের সামনে পুরো কাহিনী বর্ণনা করতে হবে, যা রূপা চাননি। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়ান, কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। রূপার শ্বশুর হুমকি দেন আশিক যদি রূপাকে ফিরিয়ে আনে, তাহলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। রূপা একজন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবেন বলে তাকে আবেগীয় প্রতারণা করা হয়। ফলে রূপা আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। এসব বিষয় তাকে আপসনামায় সই করতে প্রভাবিত করেছিল। এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে আশিকের পরিবার বিভিন্ন ধরনের ছলচাতুরির কৌশল নিয়েছিল।

পরবর্তীকালে, মামলার শুনানির সময় রূপাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপসনামায় সই করার ক্ষেত্রে তার ওপর কোনো চাপ ছিল কি-না। কিন্তু রূপা স্বেচ্ছায় সই করেছেন বলে উল্লেখ করেন। আশিকের শাস্তি হওয়া উচিত কি-না, এ বিষয়ে রূপা বারবার নিজের মত পরিবর্তন করেছেন। তালাকনামায় সই করার আগে প্রেমের বিয়ে বলে রূপা তার স্বামীর শাস্তি চাননি। আপসনামায় সই করার তিনদিন আগে আশিক তাকে ফোন করে জানতে চান, আর কতদিন রূপা তাকে শাস্তি দেবেন। আশিক তখন রূপার কাছে মুক্তি চান। তিনি ভেবেছিলেন মামলা তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন তার স্বামী। এরপর তালাকনামায় সই করার পর আশিক রূপাকে ফোন করে আবার বিয়ের প্রস্তাব দেন। তবে শর্ত জুড়ে দেন যে, রূপা মধ্যস্থতার মাধ্যমে যে টাকা পেয়েছেন, তা ফেরত দিতে হবে।

রূপার মনে হয়েছে তার স্বামীর কোনো দোষ নেই। তালাক হয়েছে তার ও তার স্বামীর দুজনেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আশিক ফোনে কান্নাকাটি করে বলেন, তার বাবাই সবকিছুর জন্য দায়ী। এর ফলে রূপার বিশ্বাস আরও পোক্ত হয় যে তার স্বামী তাকে ছেড়ে যেতে চাননি।

তবে আশিক আরেকজন নারীকে বিয়ে করেন। সেই নারীরও আগে আরেকটি বিয়ে হয়েছিল এবং সেই ঘরের একটি সন্তানও রয়েছে। এরপর রূপা বুঝতে পারেন আশিকের সাথে তার সম্পর্ক টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। রূপা মনস্থির করেন, তার স্বামীকে শাস্তি দেবেন, মামলা তুলে নেবেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আদালতে হাজির হয়ে তাকে আপসনামায় সই করতে চাপ দেওয়ার কথা তিনি জানাবেন (আইনি ভাষ্য ১৫ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৫

দুই পক্ষের যে কেউ সই করার পরও আদালতে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে এই আপসনামা উঠিয়ে নিতে পারেন। যে পক্ষ এটি উঠিয়ে নিতে চান, তাকে আদালতে হাজির হয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে (যেমন: জোরপূর্বক/প্রতারণার মাধ্যমে আপসনামায় সই নেওয়া হয়েছে)। আদালতের অনুমতিক্রমে একই আপসনামা উঠিয়ে নেওয়া যাবে। এছাড়াও, জোরপূর্বক আপসরফাকে সবসময়ই আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে এবং তা উঠিয়ে নিতে আদালতকে অনুরোধ করা যাবে।

তবে ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফার লকডাউনে আগস্ট মাস পর্যন্ত আদালত বন্ধ ছিল। আদালত পুনরায় খোলার পর এখন পর্যন্ত রূপা নতুন তারিখ পাননি।

উপসংহার

রূপার পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত, আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং স্থানীয় সাংবাদিক, ইউপি সদস্য ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রয়েছে। তবুও রূপাকে নির্দয়ভাবে পেটানোর দায়ে আশিক বা তার পরিবারের কাউকে গ্রেপ্তার করানো যায়নি। এর ফলে রূপা বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আশিক ও তার বাবা রূপাকে আবেগীয় প্রতারণা করেন। তাছাড়া সমাজের লোকজনও রূপাকে কৌশলে আপসনামায় সই করান। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় জবাবদিহির প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা কতটা কঠিন। রূপার ওপর সহিংসতা চালানোর দায়ে আশিক ও তার পরিবারকে জবাবদিহি করতে হয়নি। আর্থিক সমঝোতা করা তুলনামূলক সহজ। রূপার কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তার পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। তার জীবনযাপনের জন্য এই অর্থ যথেষ্টও নয়। তালাকের পর রূপা পড়াশোনা শুরু করেছেন। এখন তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন। ২০২১ সালের মার্চ মাসে তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু এই চাকরি ছাড়তেও তিনি বাধ্য হন, কারণ কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে আশিক তাকে হয়রানি শুরু করেছেন। এ যেন নারীর অহর্নিশ নিপীড়নের যাত্রা।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

বেশি কথা বলার অভিযোগ

বিউটি

প্রতিবেশীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত পারিবারিক সালিশে একজন নারী কথা বলছেন। বিউটির শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন তাকে বাবার বাড়ি পাঠাতে চাইল, তখনও এমন সালিশ বসেছিল।

ঝ. বেশি কথা বলার অভিযোগ: বিউটি

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাল্যবিবাহ, শিশু অবস্থায় গর্ভধারণ, আরডিআরএস, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (আরজে) সহায়ক, সালিশ, ভিন্নভাবে অক্ষম স্বামী

ভূমিকা

২০১৯ সালে, চব্বিশ বছর বয়সী কৃষক সোহাগের সঙ্গে বিউটির বিয়ে হয়। বিউটির তখন বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর। বিউটি ঢাকায় বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু বিয়ের পর তিনি রংপুর চলে যান। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মা এই বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের অল্প কিছুদিনের মাথায় তিনি শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। তার শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী যৌতুকের দাবি জানান। বিউটির গর্ভাবস্থায় যৌতুকের দাবি আরও জোরদার হয়। গর্ভবতী হওয়ার পর তাকে খাবার-দাবার ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। বিউটি তার পরিবার, স্থানীয় সমাজ এবং একপর্যায়ে আরডিআরএস বাংলাদেশের কাছে সহায়তা চেয়েছেন। কিন্তু বিউটির সাংসারিক বিবাদ মেটাতে কোনো পদক্ষেপই কার্যকর হয়নি। একপর্যায়ে তার সংসার ভেঙে যায়।

বৃত্তান্ত

বিউটি ঢাকায় বড় হয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর পোশাক কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের আগে টানা তিন বছর পোশাক কারখানায় কাজ করেছেন। তার বয়স যখন তেরো বছর, তখন তার বাবা মারা যান। তার মা নারায়ণগঞ্জে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। বিউটির বড় এক ভাই আছেন। তার ভাই-ভাবী ও মা একসঙ্গে নারায়ণগঞ্জে থাকেন। বিউটির স্বামী সোহাগ এসএসসি পাস করেছিলেন। ছোটবেলায় পোলিও আক্রান্ত হন। এর ফলে বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। ফলে তার বাবা যেসব বন্ধকি জমি নিতেন, সেখানে সোহাগ তার বাবাকে সাহায্য করতেন।

বিনিময়ে তার বাবা তাকে পারিশ্রমিক দিতেন। সোহাগের দুই বিবাহিত বোন আছে। তবে বিয়ের সময় বিউটি ও তার পরিবারের কাছে সোহাগ তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কথা গোপন করেছেন। সোহাগ ও বিউটির এক বছর বয়সী একটি সন্তান আছে।

কেস

বিউটির যখন বিয়ে হচ্ছিল, তখন রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক মশিউর গোপনে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাল্যবিবাহ ঠেকানোর দায়িত্বে থাকা ইউনিয়ন পরিষদ কমিটিকে জানাননি। তবে পুলিশ আসার আগেই বিউটির বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে পুলিশ বিউটির ভাইয়ের কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা নিয়ে চলে যায় (আইনি ভাষ্য ১৬)।

আইনি ভাষ্য ১৬

বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের আওতায় তা একটি অপরাধ। পুলিশ চাইলে পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা বাল্যবিবাহ বন্ধ বা এই ধরনের বিয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তারা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ধারা ৪)। দুর্ভাগ্যজনক হলো, বাল্যবিবাহের আইনি মর্যাদা অন্যান্য বিয়ের মতোই। অর্থাৎ বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে তা বৈধ হয়ে যায়। তবে এই কাজে জড়িত ব্যক্তিরা আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে পারেন, যা বিউটির ক্ষেত্রে ঘটেনি।

বিউটির বিয়ের প্রথম পাঁচ-ছয় মাস তার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়িতে শান্তিতেই কেটেছে। তবে সহিংসতার শুরু হয় যখন—তিনি গর্ভধারণ করেন। কারণ তখন বিউটি সংসারের কাজকর্ম ঠিকভাবে করতে পারছিলেন না। তিনি যেহেতু ঢাকায় বড় হয়েছেন, তাই ঠিকভাবে ধান মাড়াই ও ধান সিদ্ধ করতে জানতেন না। এ নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির অভিযোগ ছিল। তারা বিউটিকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেন। কারণ তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের অভিযোগ ছিল বিউটি সংসারের কাজ এড়াতে টালবাহানা করেন। তাছাড়া শ্বশুরবাড়িতে গর্ভাবস্থায় তাকে ঠিকমতো খেতে দেওয়া হতো না। বিউটির মনে আছে, তাকে শুধু ডাল-ভাত খেতে দেওয়া হতো। পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে তিনি অপুষ্টিতে ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিউটির অসুস্থতার কথা শুনে ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা অতিমারির কারণে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে তার বড় ভাই এসে তাকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যান। বিউটির শ্বশুরবাড়ির অনুমতিতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। বিয়ের আগেই বিউটির বাবা মারা যান। তাই তার বড় ভাই অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিউটি নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পর তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির কেউ তার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেননি। নারায়ণগঞ্জেই অস্ত্রোপচারের

মাধ্যমে বিউটির কন্যাশিশু জন্ম নেয়। পাঁচ ঘণ্টা শিশুটিকে অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হয়েছিল। তবে তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ তার সন্তানকে দেখতে আসেননি। অস্ত্রোপচার করে বাচ্চা হওয়ায় বিউটির বড় ভাইয়ের পঞ্চান্ন হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু সোহাগ তার নিজের সন্তানের জন্য এক টাকাও খরচ করেননি। সন্তান জন্মদানের পর বিউটি আর শ্বশুরবাড়ি আসতে পারেননি কারণ লকডাউনের কারণে চলাচলে বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু তার স্বামী তাকে হুমকি দেন, যদি বিউটি তাড়াতাড়ি ফিরে না আসে, তাহলে তালাকের নোটিশ পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত বিউটির সন্তান দুই মাস বয়স হওয়ার পর বিউটির ভাই তাকে রংপুরে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসেন।

বিউটি ফিরে আসার কয়েক মাস পর, নবজাতকের প্রথমবার চুল কাটার জন্য পান-সুপারি নামক উৎসব পালন করতে বিউটির মা রংপুরে আসেন। এটি রংপুরের একটি সামাজিক প্রথা। কিছুদিন সবকিছু ভালোই চলছিল। বিউটি তখনও অস্ত্রোপচারের ধকল কাটিয়ে ওঠেননি। কিন্তু এর মধ্যেই তাকে সংসারের সব কাজকর্ম করতে হতো। ফলে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তবে তার শ্বশুরবাড়ির কেউ বা তার স্বামী বিউটির কোনো চিকিৎসা করাননি। মেয়েসন্তান জন্ম দেওয়ায় তারা বিউটিকে বকাঝকা করতেন। সন্তানের জন্মের পর থেকে তার শ্বশুরবাড়ির কেউ তার সন্তানকে কিছুই দেননি। সন্তানের ভরণপোষণের খরচ মূলত বিউটির মা ও ভাই বহন করতেন। থাকা-খাওয়া ছাড়া বিউটির স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি থেকে আর কিছুই দেওয়া হতো না, এমনকি কাপড়চোপড়ও না।

> “
> তারা আমার কোনো চিকিৎসা করায়নি। মেয়েসন্তান জন্ম দেওয়ার দায়ে তারা শুধু আমাকে বকাঝকা করতো। আমার সন্তানের জন্মের পর থেকে তারা আমার সন্তানকে কিছুই দেয়নি। এখন পর্যন্ত আমার পরিবার যা দিয়েছে তা দিয়েই আমার মেয়ে বেঁচে আছে... আমার শ্বশুর বলেছেন, তিনি আমার সন্তানকে ছুঁয়েও দেখবেন না কারণ সে মেয়ে। ছেলে হলে তারা খুশি হতেন।
>
> —বিউটি

বিউটির শ্বশুরবাড়ি যখন তারা নতুন করে সাজালেন, তখন দুই লাখ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। তখন তারা বিউটির ভাইকে যৌতুকের বাকি বিশ হাজার টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন (এর আগে নগদ চল্লিশ হাজার টাকাসহ আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছিল)। যেহেতু বিউটির অস্ত্রোপচারের সময় তার ভাই ঋণ নিয়েছিলেন, তাই তিনি বিউটির শ্বশুর-শাশুড়িকে অনুরোধ করেন তারা যেন ঋণটা পরিশোধ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। কিন্তু তারা তাৎক্ষণিক টাকা দাবি করেন।

২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিউটির শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে প্রথম সালিশ ডাকা হয়। তাদের অভিযোগ হলো বিউটি ঘরের কাজ ঠিকমতো করেন না। তাই তারা এ বাড়িতে বিউটিকে আর রাখবেন না। তারা বিউটিকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চান। কিন্তু বিউটির পরিবার রাজি হয়নি। সেজন্য বিউটির শ্বশুর সালিশ ডাকেন। সালিশের আয়োজন করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য তারেক। সেখানে চৌকিদারসহ দুই পরিবারই উপস্থিত ছিল। বিউটির শ্বশুর প্রস্তাব করেন, বিউটি যেন আলাদা থাকে এবং নিজেদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নিজেরাই করে। কিন্তু বিউটি তা মানতে

রাজি হননি কারণ তার সন্তান তখনও ছোট। তার স্বামী আর্থিকভাবে তার শ্বশুরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এটা মানা বিউটির জন্য কঠিন ছিল—কারণ তিনি নিজেও বয়সে তুলনামূলক অনেক ছোট। সন্তানের দেখাশোনা করে সংসারের কাজ করা তার জন্য কঠিন ছিল। বাচ্চা কোলে নিয়ে তিনি জ্বালানি কাঠও আনতে পারতেন না। তখন বিউটি তালাক চান এবং স্ত্রী হিসেবে তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিতে বলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইউপি সদস্য এবং চৌকিদার বিউটির শ্বশুরকে রাজি করান যে, বিউটিকে যেন দ্বিতীয়বার একটি সুযোগ দেওয়া হয়। তারা বিউটিকে ক্ষমা চাইতে বলেন। যদিও বিউটি বুঝতে পারছিলেন না কোন অপরাধে তিনি ক্ষমা চাইবেন, তবু সংসার টিকিয়ে রাখতে তিনি ক্ষমা চান। এছাড়াও চৌকিদার বিউটির শ্বশুরকে বলেন, যদি বিউটি আবারও ভুল কিছু করে, তাহলে যেন তাকে জানায়। তবে মধ্যস্থতার পাঁচ-ছয় দিন পর তারা আবারও বিউটিকে নির্যাতন শুরু করেন। নির্যাতনের কারণ সেই একই– বিউটি ঠিকমতো ঘরের কাজকর্ম করে না। তার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে ও তার মাকে গালিগালাজ করেন। ঢাকায় থাকা এবং পোশাক কারখানায় কাজ করার দায়ে বিউটির মাকে আজেবাজে কথা বলা হয়।

> “
> তারা আমার মাকে অপমান করেন। তারা বলেন, যেসব মহিলা ঢাকা যান, তারা শরীর বিক্রি করেন।
>
> –বিউটি

নিজের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিউটি প্রতিবেশীদের বলেন, তারা যেন নিজেদের কানে শোনেন—কীভাবে তার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে গালিগালাজ করেন। কারণ প্রতিবেশীরা ঝগড়ার জন্য তাকেই দায়ী করতেন। যদিও আগে প্রতিবেশীরা তাকেই দোষারোপ করতেন, কিন্তু তার ওপর চালানো নির্যাতন ও গালিগালাজ শোনার পর এখন তার শ্বশুর-শাশুড়িকেই দোষারোপ করেন।

বিউটির শ্বশুর-শাশুড়ির অনুরোধে আরেকটি সালিশ হয়। সালিশের বিষয় ছিল বিউটি ঘরের কাজকর্ম করতে পারেন না। বিউটির মা, ভাই, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং গ্রামের সম্মানিত লোকজন সালিশে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত গ্রামবাসীর মধ্যে ছিলেন আরডিআরএসের রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক[৭] মশিউর (তিনি বিউটির গ্রামেই থাকতেন), চৌকিদার এবং নবী নামের গ্রামের একজন মুরুব্বি। সবার সামনেই বিউটিকে তার শ্বশুর-শাশুড়ি অপমান করতে থাকেন। তার ভাই বলেন, তিনি বিউটিকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে কিছুদিন রেখে কাজকর্ম শিখিয়ে আবার দিয়ে যাবেন। তবে বিউটির চাচি শাশুড়ি সেদিন তাকে যেতে দেননি। বিউটির ভাই যখন চলে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু তার ভাই পুরো বিষয়টিকে কপালের দুর্দশা বলে উল্লেখ করেন। বিউটির ভাই তার নিয়তির দোষ দিয়ে তাকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া শিখতে বলেন। একই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেন, যদি আবার তারা বিউটিকে নির্যাতন করেন, তাহলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। সেদিন রাতে বিউটির ভাই চলে যান। যদিও পরিস্থিতি কিছুদিন ভালো ছিল, কিন্তু আবার নির্যাতন শুরু হয়।

---

[৭] রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (আরজে) সহায়ক এবং কমিউনিটি অ্যানিমেটররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরডিআরএস-এর স্বেচ্ছাসেবী। তারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন, যেমন– চিকিৎসা সহায়তা পেতে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে যাওয়া, ভুক্তভোগীকে জেলা আইনি সহায়তা ক্লিনিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। একই সঙ্গে তারা ছোটখাটো বিরোধের মীমাংসা করেন।

বিউটির ভাইয়ের অনুরোধের ওপর ভিত্তি করে, আরডিআরএসের আরজে সহায়তাকারী মশিউর বিউটির শ্বশুরবাড়িতে দুটি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিউটির ভাই মশিউরকে ফোনে অনুরোধ করার পর তিনি বিউটির শ্বশুরবাড়িতে যান। মশিউর সেই বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে পান দুই পক্ষই একে অপরকে গালিগালাজ করছেন। বিউটির শ্বশুরবাড়ি থেকে মশিউরের কাছে অভিযোগ করা হয় বিউটি খুবই গালিগালাজ করেন এবং তার শাশুড়ির জন্য সংসারের সব কাজ ফেলে রাখেন। বিউটির শাশুড়ি সারাদিন ফসল তোলা ও চাষবাসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—বলা হয় মশিউরকে। অন্যদিকে বিউটি মশিউরকে জানান তিনি-ই বেশিরভাগ কাজ করেন। কিন্তু বাচ্চার দেখাশোনা ও নিজের অসুস্থতার কারণে মাঝেমাঝে সব কাজ শেষ করতে পারেন না। বিউটির শ্বশুর-শাশুড়িকে মশিউর অনুরোধ করেন বিউটির ব্যাপারে ধৈর্যশীল হতে, কারণ সংসার সামলানোর মতো বয়স বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই বিউটির হয়নি। এরপর সেদিনের মতো মশিউর চলে যান।

তবে বিউটির ভাই পরদিন আবার মশিউরকে অমীমাংসিত ঝগড়া মেটানোর জন্য ফোন করেন। মশিউর আবার বিউটির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ঝামেলা মিটিয়ে দুইজনেরই শান্তিতে বসবাস করার চেষ্টা করা উচিত।

মশিউর বিয়ে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সোহাগকে রাজি করাতে তার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বিউটির কোনো অসম্মান না করা এবং তার প্রতি বিউটির সেবাযত্নের বিষয়টিকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। তবে মশিউর চলে আসার পর শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

একদিন বিউটির শাশুড়ি বিউটির শ্বশুরের কাছে অভিযোগ করেন, বিউটি তাকে আজেবাজে ভাষায় কথা বলেছেন। শাশুড়ির মতে, বিউটি রাগ দেখিয়ে বলেছেন তিনি কাজ করতে জানেন না। সে শুধু জানে কীভাবে স্বামীর সঙ্গে শুতে হয়। তবে বিউটি এ ধরনের কথা বলেছেন বলে স্বীকার করেননি। রাগান্বিত হয়ে বিউটির শ্বশুর কুড়াল নিয়ে তাকে মারতে যান। বিউটিকে 'বেশ্যা' বলে গালি দিতে শুরু করেন। বিউটির গর্দান ফেলে দেওয়ার হুমকিও দেন। বিউটির শ্বশুর তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে চাননি। বিউটির হাতের রান্নাও খাবেন না বলে জানিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত বিউটির মা এসে তাকে নিয়ে যান।

বিউটি ও তার মেয়েকে পাঁচদিন ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপর বিউটি ও তার মা আরেকটি মধ্যস্থতার দাবি জানান। এই মধ্যস্থতা পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যানিমেটর পারভিন, যাকে মশিউর ঘটনাগুলো জানিয়েছিলেন। বিউটি ও তার মা পারভিনের কাছে অভিযোগ করেন বিউটির শ্বশুর তাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। পারভিনও ঝগড়া মেটাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর পারভিন পরামর্শ দেন বিউটি ও তার মা যেন রংপুরের জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে গিয়ে আইনি সহায়তার জন্য আবেদন করেন। বিউটিকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরপর তিনি তার শ্বশুর-শাশুড়িকে শিক্ষা দিতে ডিল্যাকে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে আরডিআরএস সহায়তা করে (কারণ আরডিআরএস সরাসরি মামলা না করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠায়)।

বিউটিকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর তিনি তার মায়ের সঙ্গে নানির বাড়িতে থাকছিলেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগ দায়ের করার পর গ্রামের সম্মানিত লোকেরা তাকে ফিরিয়ে নিতে আসেন। তারা ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে আরেকটি সালিশ ডাকেন। যেহেতু বিউটির সন্তান ছিল, তাই তাদের মনে হয়েছে বিউটির অবশ্যই সংসার করা উচিত এবং তার শ্বশুর-শাশুড়িরও তাকে গ্রহণ করা উচিত। এখান থেকে সমাজের রীতিনীতির উদাহরণ পাওয়া যায় যে—সন্তানের জন্য হলেও সংসার টিকিয়ে রাখা উচিত। গ্রামের সম্মানিত লোকজন বিউটিকে সাহস দেন, তিনি যেন ফিরে গিয়ে নিজের সংসারের অধিকার আদায় করেন। বিউটি তার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান। আবার কিছুদিনের জন্য সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। কিন্তু জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের নোটিশ আসা মাত্রই আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ অবস্থায় তার শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেন। কিন্তু বিউটি পাল্টা হুমকি দেন যদি তাকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি আবার গিয়ে অভিযোগ জানাবেন।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যৌতুক নিরোধ আইনে অভিযোগ দায়ের করার পর বিউটির শ্বশুর-শাশুড়ি ভয় পেয়ে যান। তারা তাকে গ্রামীণ সালিশের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে চান। ইউনিয়ন পরিষদ এই সালিশের ব্যবস্থা করে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউপি সদস্য শামীম মিয়া এবং আরজে সহায়তাকারী মশিউর সেই সালিশে উপস্থিত ছিলেন। সালিশের পর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে দায়ের করা অভিযোগ উঠিয়ে নেওয়া হয়।

২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে বিউটি ও তার স্বামী অভিযোগ উঠিয়ে নিতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যান। তবে অভিযোগ উঠিয়ে নিতে গেলে কিছু কাগজপত্রে সই করতে হতো, যা বিউটির শ্বশুরবাড়ির কাছে বিভ্রান্তিকর ও হুমকিস্বরূপ মনে হয় (জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের একটি চিঠি ছিল, যা তারা আদালতের নোটিশ ভেবেছিল)। এর ফলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে ও তার পরিবারকে গালিগালাজ শুরু করেন। পাশাপাশি তারা বিউটির আদালত প্রাঙ্গণে যাওয়ার মতো দুঃসাহস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর বিউটি তার শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। যদিও তার স্বামী তাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিউটিও চুপ থাকবে না বলে জানান। তিনি তার স্বামীকে জুতা দিয়ে পেটাবেন বলে হুমকি দেন। এ কথা শোনার পর তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করেন। এরপর তার শাশুড়িও তাকে জ্ঞান হারানোর পূর্বপর্যন্ত পেটান। ক্ষিপ্ত ও হতাশ হয়ে বিউটি তিন দিন রান্নাবান্না ও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেন। তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি খাবার আনতে বাইরে যেতেন। এ অবস্থায় বিউটির শ্বশুরবাড়িতে আরেকটি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হয়। পারভিন ও বিউটির ভাই মধ্যস্থতার দায়িত্ব নেন। এরপর সিদ্ধান্ত হয় বিউটি তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে আলাদা হয়ে সংসার করবেন।

তবে আলাদা সংসার শুরু করলেও বিউটির সংসার টেকেনি। ২০২১ সালের জুলাই মাসে বিউটি ও সোহাগের তালাক হয়ে যায়। বর্তমানে বিউটি সন্তানসহ তার ভাই ও মায়ের সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তিনি আবার একটি পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেছেন। তিনি এখন তার মেয়েকে শিক্ষিত করে একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন।

উপসংহার

বিউটি তার পরিবারের চাপে বাল্যবিবাহ করতে বাধ্য হন। এরপর শ্বশুরবাড়িতে তিনি শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সহিংসতার শিকার হন। গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তার প্রতি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে অবহেলা করা হয়। কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে বিউটি সারাক্ষণ লাঞ্ছনার শিকার হতেন। অল্প বয়সে সন্তানের দেখাশোনা এবং অস্ত্রোপচার করার ফলে শারীরিকভাবে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিউটিকে অনেক বেশি কাজ করতে বলা হতো। আর তা ঠিকমতো না করতে পারলে তাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহিংসতার শিকার হতে হতো। পাশাপাশি বিউটিকে ঝগড়াটে মেয়ে হিসেবে দেখা হতো। তাকে শায়েস্তা করতে তার শ্বশুর-শাশুড়ি নির্যাতন শুরু করেন। বিউটি ক্রমাগত তার বড় ভাই, মা, কমিউনিটি অ্যানিমেটর পারভিনের কাছে সাহায্য চেয়েছেন—যেন তার সংসার টিকে থাকে। তবে যেসব নির্যাতন তাকে করা হয়েছে, মধ্যস্থতাগুলোতে তা বন্ধে কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বরং মধ্যস্থতার বিষয় ছিল সংসার টিকিয়ে রাখা, বিউটিকে আদব-কায়দা শেখানো এবং সবকিছু মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া। অন্যদিকে তার পরিবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে বিউটির বিয়ে টিকিয়ে রাখতে। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। তার তালাক হয়ে গেছে।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

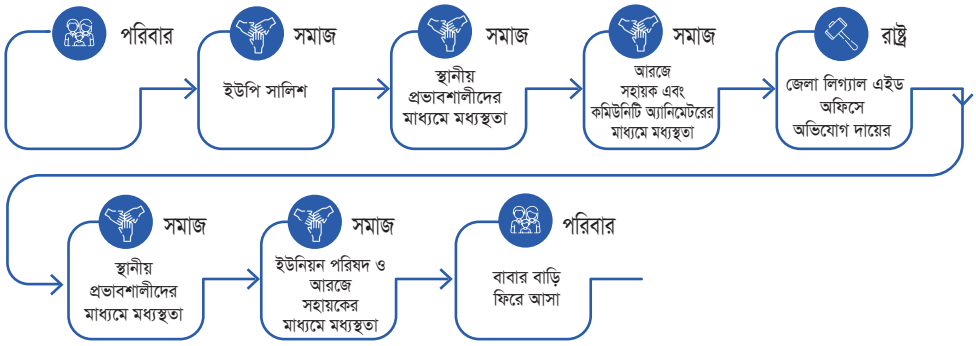

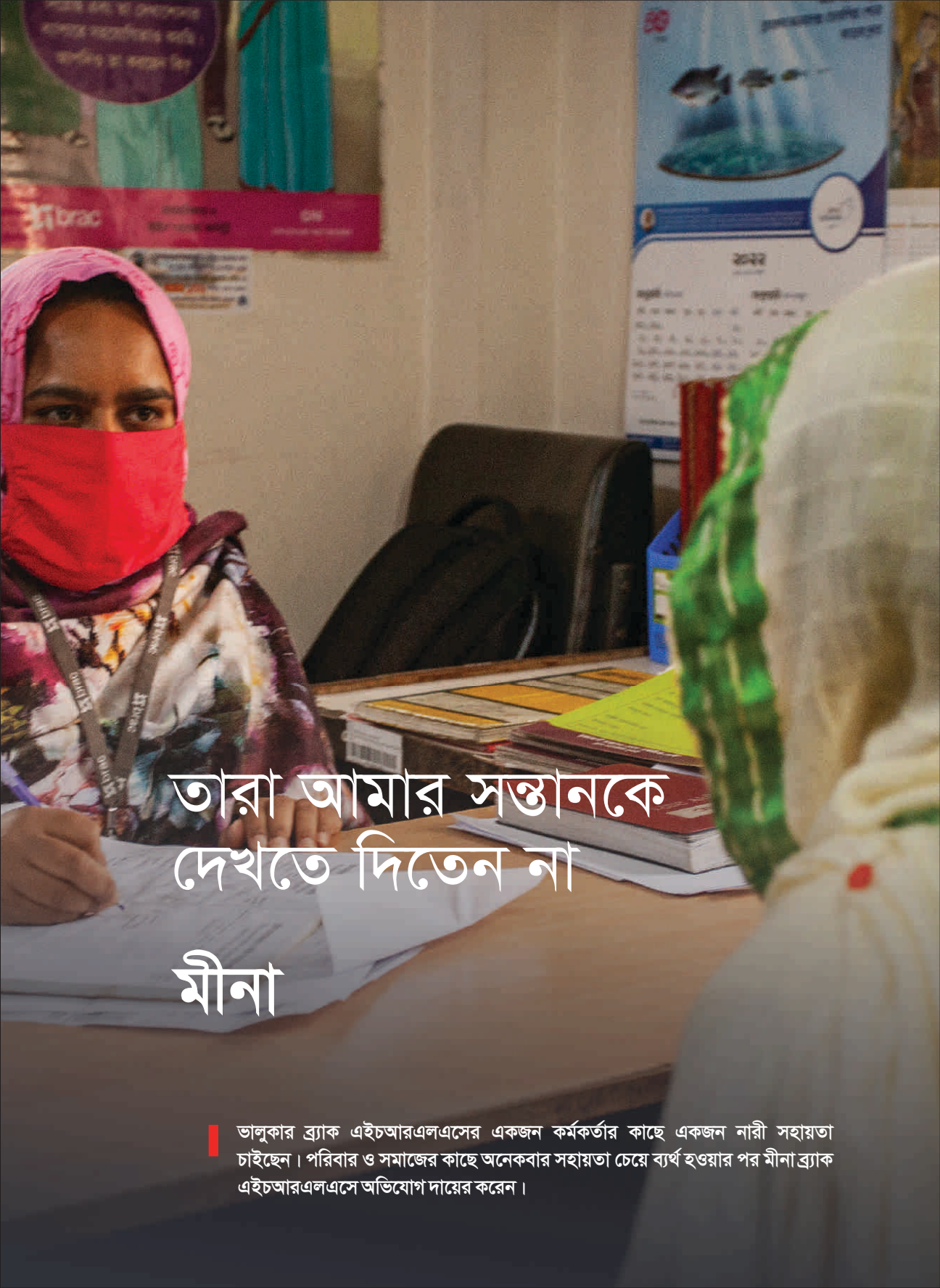

তারা আমার সন্তানকে দেখতে দিতেন না

মীনা

ভালুকার ব্র্যাক এইচআরএলএসের একজন কর্মকর্তার কাছে একজন নারী সহায়তা চাইছেন। পরিবার ও সমাজের কাছে অনেকবার সহায়তা চেয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর মীনা ব্র্যাক এইচআরএলএসে অভিযোগ দায়ের করেন।

ঞ. তারা আমার সন্তানকে দেখতে দিতেন না –মীনা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাল্যবিবাহ, শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন, সালিশ, বিষপ্রয়োগ, সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, এনজিওর হস্তক্ষেপ, পুলিশের হস্তক্ষেপ

ভূমিকা

মীনার বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার শান্তিপুর গ্রামে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে পলাশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পলাশ তখন পঁচিশ বছর বয়সী অটোরিকশাচালক। তার বাড়িও একই গ্রামে। মীনার বিয়ে হয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিশ হাজার টাকা যৌতুকের বিনিময়ে। বাল্যবিয়ের শিকার মীনা এরপর তার স্বামী, শাশুড়ি এবং মাঝে মাঝে ননদের হাতেও পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সহিংসতা এমন মাত্রায় চলে যায় যে একপর্যায়ে তার স্বামী তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে। তার দিকে ইঙ্গিত ছিল সে পরকীয়া করে। মীনার বাবা সমাজ, পুলিশ এবং ব্র্যাকের এইচআরএলএসের কাছে সহায়তা চাওয়ার মাধ্যমে নিজের মেয়ের জন্য আইনি সুরক্ষার চেষ্টা করেন। বর্তমানে মীনা তার মেয়েসহ স্বামীর সঙ্গে থাকেন। সম্প্রতি মীনার একটি ছেলেসন্তান জন্ম নিয়েছে। মীনা দাবি করেছেন এখন তিনি আর নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন না।

বৃত্তান্ত

মীনার বাবা-মা দুইজনই দিনমজুর। বেশিরভাগ সময় তারা 'হলুদ' ক্ষেতে কাজ করেন। শান্তিপুর গ্রামে মীনা তার আরও দুই বোনের সঙ্গে বড় হয়েছেন। সেখানে মীনা ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ২০১৭ সালে পলাশের সঙ্গে বিয়ের পর তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। মীনার মতো পলাশও ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। মীনাকে বিয়ে করার আগে পলাশ আরেকটি বিয়ে করেছিলেন। সেই স্ত্রী পলাশ ও তার পরিবারের নির্যাতনের কারণে ছয় মাসের মধ্যে চলে যায়। বিয়ের পর মীনা তার স্বামী পলাশ ও শাশুড়ির সঙ্গে ফুলবাড়িয়ায় থাকতেন। ফুলবাড়িয়ায় তাদের

বাড়ি বেশ দুর্গম এলাকায়, পাহাড়-বনে ঘেরা। মীনার শ্বশুরের পেশা ছিল নিজের ক্ষেতে বেশিরভাগ মৌসুমি ফল, সবজি এবং হলুদ চাষ। মীনা ও পলাশের তিন বছর বয়সী একটি মেয়ে এবং সদ্য জন্মলাভ করা একটি ছেলে রয়েছে।

কেস

পুরো সংসারজীবনে মীনা শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। মূলত তার স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদ এসব সহিংসতা চালিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারতেন না—কেন তার ওপর এসব সহিংসতা চালানো হতো।

> “সে আমাকে বলত না কেন মারধর করে। সে আমাকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে মারধর করতো, নির্যাতন করতো। এমনকি আমাকে বলতও না কেন মারধর করছে।
>
> —মীনা

মীনার বাবা ইয়াকুব হোসেন একদিনের ভয়ানক সহিংসতার বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি ছিল পলাশের বিষপ্রয়োগ করে মীনাকে হত্যার চেষ্টা। এর কারণ, মীনার বাবার কাছ থেকে পলাশ টাকা ধার নিয়েছিলেন। মীনা সেই টাকা ফেরত দিতে বলেছিলেন। মীনার বাবা ব্যাংকে টাকা রাখার পরিবর্তে জামাতা পলাশকে বিশ্বাস করে তার কাছে টাকা রাখতেন জমানোর উদ্দেশ্যে। সব মিলিয়ে পলাশের কাছে তিনি ষাট হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন। তিনি পলাশকে নিজের ছেলের মতোই মনে করতেন। মীনা তার বাবার দাবির সত্যতা স্বীকার করেছেন, তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিল কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি চুপ থেকেছেন। বিষপ্রয়োগের পর তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় তিনি বেঁচে যান। চিকিৎসার খরচ পলাশ বহন করেছিলেন।

এ ঘটনার পর প্রথম সালিশ বসে। সালিশের মাধ্যমে অবশ্য সহিংসতা বন্ধ করা যায়নি। তবে সেবার মীনা তার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে পেরেছিলেন। মীনার বাবা যখন জানতে পারেন মীনাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে, তখন তিনি হাসপাতাল থেকে মীনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর মীনার বাবা এই ঘটনায় সালিশ ডাকেন। তাদের এলাকার চারজন ইউপি সদস্য সালিশ পরিচালনা করেন। তারা এই মর্মে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, পলাশ মীনাকে নির্যাতন বন্ধ করবেন এবং বাড়ি নিয়ে যাবেন।

মীনার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। প্রতিশ্রুতি দেন যে আর মারধর করবেন না। কিন্তু দ্রুতই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। সালিশের পাঁচ-ছয় মাস পর পলাশ আবার মীনাকে প্রচণ্ড মারধর করেন। এমনকি তিনি খাবার কেনা বন্ধ করে দিয়ে মীনাকে অনাহারে রাখেন। একপর্যায়ে মীনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। মীনার সদ্যোজাত শিশুকে পনেরো দিন তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুটি তার দাদির সঙ্গে ছিল। মীনার

সন্তান ফিরে পাওয়া নিয়ে দ্বিতীয় সালিশ বসে। আগেরবারের ইউপি সদস্যদের মধ্য থেকে তিনজন এবার সালিশ পরিচালনা করেন। সালিশে ইউপি সদস্যরা পলাশকে বলেন—মীনার সন্তান ফিরিয়ে দিয়ে মীনাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরত নিয়ে যেতে। কয়েকদিন পর, পলাশ এই সিদ্ধান্ত মেনে মীনাকে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু নেওয়ার পর আবার নির্যাতন শুরু হয়।

মীনা যখন তার স্বামীর মারধরের পর বারবার ইউপি সদস্যদের কাছে সহায়তা চাইছিলেন, তখন তারা তাকে তালাকের পরামর্শ দেন। মীনাকে বারবার তার স্বামীর সহিংসতার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ইউপি সদস্য বলেন, মীনার স্বামী পলাশ স্বভাবগতভাবে 'শয়তান'।

> এই লোক, তার স্বামী একটা শয়তান। সে তাকে মারধর করে। সে নেশার ঘোরে এমন করে না। আসলে সে একটা দুষ্ট লোক।
>
> —স্থানীয় ইউপি সদস্য

ইউপি সদস্যরা মীনাকে বলেন, তার স্বামী বদলাবে না। সুতরাং তালাক দিয়ে দিলেই তার জন্য ভালো হবে। এই পরামর্শ মীনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, কারণ তার একটি সন্তান আছে। যদি তালাক দিয়ে দেন তাহলে তার সন্তান 'এতিম' হয়ে যাবে। তার কাছে মনে হয়েছে সন্তানের বাবা যদি পাশে না থাকে, তাহলে তার সন্তান 'অভিভাবকহীন' হয়ে পড়বে। তিনি দেখতে চাইছিলেন, তার স্বামী ভালো ব্যবহার করে কি-না। এছাড়াও যারা সেবাপ্রদানের বিনিময়ে টাকা দিতে পারে না, তাদের ব্যাপারে ইউপি সদস্যদের আন্তরিকতা নিয়ে মীনা প্রশ্ন তোলেন। মীনা মনে করতেন ইউপি সদস্যরা শুধু তাদের পক্ষেই কাজ করেন, যারা তাদের কিছু দিতে পারেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মীনা বলেন, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন।

> [ইউপি সদস্যরা বলেন] 'যেহেতু এতগুলো সালিশের পরও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাহলে এটা শেষ করে দাও।' আমি বললাম, 'আপনারা এটা শেষ করে দিতে চান? কিন্তু আমার তো একটি সন্তান আছে। আমাকে আবার চেষ্টা করতে দিন, যদি অবস্থা ভালো হয়! আমি যদি তাকে বদলাতে পারি! তা না হলে আমার সন্তান এতিম হয়ে যাবে।'
>
> —মীনা

করোনা অতিমারি আঘাত হানার ঠিক আগে মীনার স্বামী তাকে আবার মারধর করেন। তাকে তার সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। দ্বিতীয়বারের মতো শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। এ ঘটনার আগের দিন তার শাশুড়ি তাকে গালিগালাজ করেন। কারণ তিনি দেরি করে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন এবং বাইরে যে ধান রেখেছিলেন, ছাগল তা খেয়ে ফেলেছিল। যেদিন তাকে মারধর করা হয়, সেদিন তিনি হলুদ আনতে ক্ষেতে গিয়ে হলুদের পাতা কেটে আনেন। এর আগে তিনি শুধু ভাত রান্না করেন। ভেবেছিলেন তার শাশুড়ি তরকারি রান্না

করবেন, এরপর সবাই একসঙ্গে দুপুরে খাবেন। মীনা তরকারি রান্না করেননি কারণ তার শাশুড়ি নিজেই এটা রান্না করতে চান। মীনার রান্না তার পছন্দ নয়। কিন্তু সেদিন, মীনার শাশুড়ি তাকে খেতে ডাকেননি। বরং তার স্বামী ও ননদের সঙ্গে তার শাশুড়ি খেয়ে নেন। মীনা চুপ করে সারাদিন না খেয়ে থাকেন। তিনি মনে করেছিলেন যদি কিছু বলে, তাহলে আরও বেশি গালিগালাজ ও নির্যাতন সহ্য করতে হবে। পরের দিন মীনা ও তার স্বামীর মধ্যে জমিয়ে রাখা পানি নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। তার স্বামী যখন জমিয়ে রাখা পানি নিয়ে শৌচাগারে যান, মীনা তখন জিজ্ঞেস করেন তার জন্য কেন পানি রাখা হয়নি। তখন পলাশ রেগে মীনাকে মারধর করেন এবং তখনই মীনাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

পরদিন পলাশ মীনাকে বলেন—সে যেন তার চাচাকে ফোন করে তাকে নিয়ে যেতে বলে। মীনার শাশুড়ি ও ননদ মীনার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন। পরিস্থিতি ভালো হবে এই আশায় মীনা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। মীনা ঘরে ঢুকতে চাইলে তার শাশুড়ি তাকে গালিগালাজ করতে থাকেন। তিনি জানতে চান কেন তাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে। এছাড়া মীনা তার শাশুড়ির কাছে জানতে চান, কেন তিনি তার সঙ্গে নিজের মেয়ের মতো আচরণ করেন না! মীনার শাশুড়ি ও ননদ তখন আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে আরও বেশি নির্যাতন শুরু করেন।

> “তারা আমাকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না। কিন্তু তবু আমি ঢুকতে চেষ্টা করি। তখন তারা আমাকে গালিগালাজ শুরু করেন, বিশেষ করে আমার শাশুড়ি। তখন আমি বলেছি, ‘আপনারা সবাই কেন আমাকে গালিগালাজ করছেন? আমাকে গালি দেওয়া তো আপনার মেয়েকে গালি দেওয়ার মতোই।’ এসব কথা বলার পরই তারা আমাকে মারতে শুরু করেন।
>
> —মীনা

মীনা এরপর প্রতিবাদ করেননি। কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তারা তাকে খুন করে লাশ জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলতে পারেন। তাকে হয়তো আর কোনোদিন খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

শেষ পর্যন্ত মীনা তার মাকে ফোন করেন। তিনি এসে মেয়েকে নিয়ে যান। মারধর, গালিগালাজ, সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া– সব সহ্য করার পর মীনা পলাশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২০ সালের ১০ মার্চ মীনার বাবা সাহস জোগানোর ফলে মীনা ব্র্যাকের এইচআরএলএসে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর মার্চের ১১ এবং ২৫ তারিখে পলাশের কাছে দুটি নোটিশ পাঠানো হয়। সমঝোতা এবং সন্তান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাকে ডাকা হয়। সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয় কারণ শিশুটি খুবই ছোট। মা ছাড়া থাকা তার জন্য খুব কঠিন। কিন্তু পলাশ কথা মানেননি।

ব্র্যাক এইচআরএলএসের কর্মকর্তা জয়দ্বীপ মীনার অভিযোগ দেখাশোনা করছিলেন। জয়দ্বীপ একজন ইউপি সদস্যকে ফোন করে মীনার সন্তান ফিরিয়ে আনতে সাহায্য চান। ইউপি সদস্য তখন পলাশকে ফোন করেন। এরপর জয়দ্বীপকে ইউপি সদস্য ফোন করে জানান মীনার কাছে সন্তান ফিরিয়ে দিতে পলাশ রাজি হয়েছেন। এরপর মীনা ও তার মা যখন সন্তান আনতে মীনার শ্বশুরবাড়ি যান, তখন মীনার স্বামী ও শাশুড়ি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার কারণে মীনাকে অপমান করেন। তারা সন্তান ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। মীনা আকুতিমিনতি করে একবার শুধু তার সন্তানকে দেখতে চান। কিন্তু তাতেও তারা রাজি হননি। কারণ মীনার মেয়ে যদি একবার মীনাকে দেখে, তাহলে তাকে মীনার কাছ থেকে আলাদা করে রাখা যাবে না। এরপর তারা মীনার মায়ের সঙ্গে মীনার মেয়েকে দেখা করতে দিতে রাজি হন, কিন্তু মীনার সঙ্গে নয়। তিনি বলেন,

“

আমি সাত মাস বাবার বাড়ি ছিলাম। কিন্তু তারা আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দেননি। আমি নিজের সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তারা আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। [তারা বলেন], ‘তোর কত বড় সাহস আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিস? আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব। তোকে আধা-কাপড়ে রাখব ইত্যাদি।’

বিভিন্ন উছিলায় মীনা তার শ্বশুরবাড়ি গেছেন শুধু তার মেয়েকে একনজর দেখতে। একবারও তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি।

“

আমি সবসময় সেই বাড়িতে গেছি আমার সন্তানের কথা ভেবে। যখনই আমি সেখানে যেতাম, আমার শাশুড়ি বলতেন—আমার সন্তান মরে গেছে। আমি দুপুর ১টায় সেখানে গেছি। তারা বলেন, ‘কাল আয়, আজকে দেখতে দেওয়া যাবে না।’ আমি ইউপি সদস্যকে ফোন করেছি, [আশা করে যে] তিনি আমার সন্তানকে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন।

—মীনা

মীনার সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে ব্র্যাক এইচআরএলএস কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারেনি, কারণ করোনা অতিমারির কারণে দেশব্যাপী প্রথম লকডাউন তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও তারা ২০২০ সালের ২৫ মার্চ পলাশকে দ্বিতীয় নোটিশ পাঠিয়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির তারিখ ধার্য করেন, কিন্তু ততদিনে চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার কারণে মধ্যস্থতার জন্য বসতে পারেননি। ব্র্যাক এইচআরএলএসের অফিস ও আদালত সবই তখন বন্ধ ছিল। তাছাড়া পুলিশও লকডাউন পদক্ষেপ বলবৎ করা এবং ত্রাণ বিতরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্র্যাক এইচআরএলএসের কর্মকর্তা ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে পুলিশের সহায়তা চেয়েছেন। করোনা অতিমারির কারণে থানার ফটকে বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। তখন শুধু জরুরি মামলা নেওয়া হচ্ছিল। জয়দ্বীপ নিজের পরিচয় দেওয়ার পর পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) নিচে নেমে এসে মামলা নিয়েছিলেন। মামলা শক্তিশালী

করতে পলাশের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। জিডিতে উল্লেখ করা হয়, পলাশ মায়ের দুধপানকারী শিশুকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন এবং যৌতুক দাবি করেছেন। পুলিশ তখন অপরাধী পলাশের বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি মীনাদের বাড়িতে যায়। এর ফলে মীনা ও তার মা বুঝতে পারেন পুলিশকে দিয়ে কাজ করাতে হলে কিছু প্রণোদনা দিতে হবে। তখন তারা পুলিশকে দেড় হাজার টাকা দেন।

এরপর পুলিশ মীনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে যায়। পুলিশের ভয়ে পলাশ মীনাকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিতে আসেন। কয়েক মাসের সংগ্রামের পর মীনা তার দুই বছরের শিশুকে ফিরে পান। এর ফলে মীনার মনে হয়েছে পুলিশ তাদের দায়িত্বে অবহেলা করেছে। এক্ষেত্রে তারা করোনা অতিমারিকে শুধু বাহানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

মীনার ক্ষেত্রে, পুলিশের এসআই বলেন, তারা নারীদের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেন। কারণ নারীরা সাধারণত 'দুর্বল' এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত। এমন পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার পরও পুলিশের এই কর্মকর্তা অনেক সহায়তা করেছেন।

"

আরেকটি বিষয় হলো, যদি কোনো নারীর কিছু হয়, আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিই। কারণ নারীরা সামাজিকভাবে খুবই অবহেলিত, দুর্বল প্রকৃতির, বিচারপ্রত্যাশী; সেজন্যই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিই। আমরা পরিবার ও অভিভাবকের জায়গা থেকে এবং আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে সবসময়ই তা করি। এটাই আমাদের মূল কাজ।

—পুলিশের স্থানীয় একজন উপ-পরিদর্শক

ইউপি সদস্যদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সালিশের সময় একজন ইউপি সদস্য মীনাকে 'বদমেজাজী' এবং 'ধৈর্যহীন' বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, যদি পলাশের রাগের সময় মীনা চুপ থাকতেন, তাহলে মীনার ওপর পলাশ বেশি নির্যাতন করতেন না। মীনার স্বামীকে সন্দেহ করা এবং তার চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করার দায়ে সেই ইউপি সদস্য মীনাকে দোষারোপ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, পুরুষ হিসেবে যে কোনো সময় যে কারো সঙ্গে পলাশের কথা বলার অধিকার রয়েছে, এমনকি তার সাবেক স্ত্রীর সঙ্গেও। পলাশের ফোন থেকে কাকে ফোন করা হয়েছে, সেটা দেখতে চেয়ে মীনা পলাশের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তার স্বাধীনতা সীমিত করেছে।

"

আমি বাবুলকে [মীনার চাচা] বলেছি, 'বাবুল, তোমার ভাতিজির কিছু সমস্যা আছে। সে রাগী। একজন পুরুষ কাকে ফোন করবে না করবে, সে ব্যাপারে নাক গলানো যাবে না। যদি খারাপ কিছু ঘটে, তাহলে আমরা তো আছি। পুরুষের স্বাধীনতা থাকা উচিত, যা হওয়ার হয়েছে।' পরে বিভিন্ন সময়ে এসব বিষয় নিয়েই ঝগড়া-মারামারি হয়েছে।

—স্থানীয় একজন ইউপি সদস্য

মীনা যেসব পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, সেগুলোকে তিনি বারবার সাজা-শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে তার স্বামী ও শাশুড়ির হাতে তাকে মারধর, গালিগালাজ, জবরদস্তি এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল করার কর্তৃত্ব রয়েছে। এছাড়াও তিনি মনে করেন, তার স্বামী ও শাশুড়ি বৈধ কারণে তাকে মারধর করতে পারেন। বৈধ কারণের মধ্যে সংসারের কাজকর্মে অবহেলাও অন্তর্ভুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

ফলোআপ সাক্ষাৎকারে মীনা বলেন, তার স্বামী তাকে আর মারধর করেন না। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তাদের একটি ছেলেসন্তান হয়েছে। গবেষক দলের কাছেও মনে হয়েছে মীনা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন তাকে যেন আবার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া না হয়। সম্ভবত ব্র্যাক এইচআরএলএসের ফলোআপ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের কারণেই বর্তমানে শান্তি বিরাজ করছে।

উপসংহার

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া মীনার ওপর তার স্বামী ও শাশুড়ি সহিংসতা চালান। তার ওপর বিষপ্রয়োগ করা হয়। এর ফলে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে তিনি তার স্বামীর সংসারে ফিরে গেছেন। সহিংসতা বন্ধে মীনা আগে-পরে অনেক জায়গায় গেছেন, যেমন– পরিবার, সমাজ, এনজিও এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সবার কাছে তিনি প্রতিকার চেয়েছেন। কিন্তু সহিংসতা বন্ধ হয়নি। সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার পর তার সন্তানের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এরপর পুলিশ ও ব্র্যাক এইচআরএলএসের গৃহীত পদক্ষেপে মীনা তার সন্তান ফিরে পান। এখন তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকছেন। সম্প্রতি মীনার একটি ছেলেসন্তান হয়েছে।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

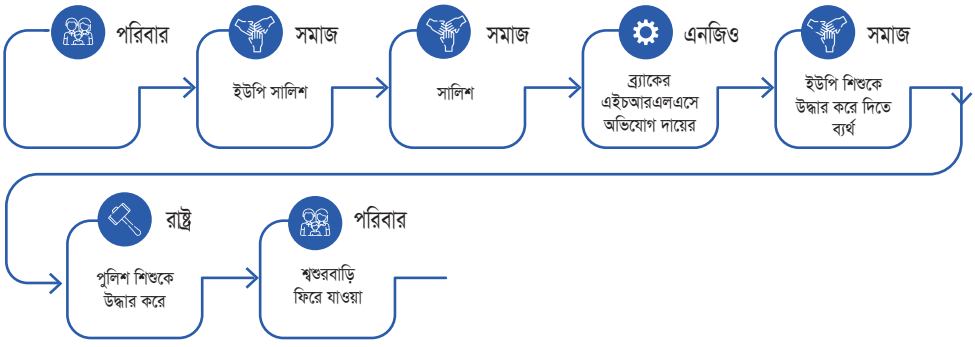

আমি আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাই

রেশমা

ব্লাস্টের পটুয়াখালী অফিসে একজন স্টাফ আইনজীবীর সঙ্গে একটি পরিবার কথা বলছে।

ট. আমি আমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাই –রেশমা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ব্লাস্ট, প্যানেল আইনজীবী, সালিশ, হাসপাতাল

ভূমিকা

রেশমার বয়স সাতাশ বছর। তার বাড়ি পটুয়াখালী। তিনি প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তার দুটি সন্তান রয়েছে– বারো বছর বয়সী একটি ছেলে এবং আট বছর বয়সী একটি মেয়ে। সালিশের মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। সালিশ প্রচেষ্টার সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সাহায্যের জন্য ব্লাস্টের সহায়তা নিয়েছেন। প্রথমে তার ঘটনাটি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কারণ রেশমা সংসার টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তবে তার স্বামী সুজন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনে সংসার টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেননি। এরপর ব্লাস্ট ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক আইনে আরেকটি মামলা দায়ের করে। এই মামলা বর্তমানে চলমান। রেশমা এখনও তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চান। তার আশা, একদিন সুজন তাকে আর মারধর করবেন না। তিনি তার দুই সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন।

বৃত্তান্ত

রেশমা পটুয়াখালীর বেলতলা গ্রামের বাসিন্দা, বয়স সাতাশ। তার বাবা একজন মাছ ব্যবসায়ী, মা গৃহিণী। তার এক বড় ভাই আছে, বিবাহিত। তার ভাই গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা অতিমারির সময়ে লকডাউনের কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, তিনি বেলতলা গ্রামে ফিরে আসেন। এখন তিনি মোটরসাইকেলে যাত্রীসেবা দিয়ে উপার্জন করছেন। রেশমার একটি ছোট বোন আছে, তিনি-ও

বিবাহিত। রেশমার বাবার বাড়ির পাশে একটি খাল আছে। বর্ষাকালে তাদের বাড়ি জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে। রেশমা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু সুজনের সঙ্গে বিয়ের পর তিনি আর পড়াশোনা করতে পারেননি। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তার বাবা-মা। ২০০৭ সালে পনেরো অথবা ষোলো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল সত্তর হাজার টাকা। রেশমার আত্মীয়রা বলেছিলেন, সুজনের পরিবার 'ভালো' কারণ তাদের স্থায়ী আয়রোজগার আছে। সেজন্যই রেশমার বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। যদিও রেশমা বলেছেন, বিয়ের সময় তারা কোনো যৌতুক দেননি। কিন্তু নতুন সংসার শুরু করতে গেলে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই রেশমার বাবা-মা দিয়েছিলেন যেন—'কেউ কিছু বলতে না পারেন'। অবশ্য উপহারের আড়ালে এগুলো যৌতুকই ছিল।

কেস

বিয়ের পর রেশমা তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যৌথ পরিবারে থাকতেন। তবে কয়েক বছর পর তারা আলাদা হয়ে নিজেরা সংসার শুরু করেন। তার স্বামী উপার্জনের জন্য কয়েক ধরনের কাজ করতেন। তিনি গাছ বিক্রি করতেন আবার রিং-স্লাবও বিক্রি করতেন। তাদের বারো বছর বয়সী একটি ছেলে এবং আট বছর বয়সী একটি মেয়েসন্তান আছে। সুজন ষোলো বছরের সংসার জীবনে রেশমা বা তাদের সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ কোনো খরচ দেননি। রেশমা পাশের বাড়িতে কাজ করে নিজের ও সন্তানের খরচ বহন করেন।

রেশমার বিয়ের প্রথম কয়েক মাস ভালোই কেটেছে। তবে কিছুদিন পরই তার শাশুড়ি বিভিন্ন গল্প বানিয়ে সুজনের কাছে নালিশ করতে থাকেন। তার শাশুড়ি তাকে মারধরও করতেন। সুজনও তাকে গালিগালাজ ও মারধর করতেন। আবার বাড়ি থেকে বের করেও দিতেন। রেশমার মতে, যখনই তিনি নিজের কোনো মতামত দিতেন বা নিজের জন্য অথবা সন্তানদের জন্য কিছু চাইতেন, তখনই সুজন তাকে মারধর করতেন। রেশমার শাশুড়ি ও স্বামী দুজনই রেশমার বাবা-মাকে গালিগালাজ ও অপমান করতেন। রেশমা জানান যৌতুকের দাবিতে তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। রেশমার বাবা যখনই কিছু দিতে ব্যর্থ হতেন, তখনই সহিংসতা শুরু হতো।

রেশমা ও তার পরিবারের ধারণা, সুজন মাদকাসক্ত কারণ তিনি প্রচুর ধূমপান করতেন এবং রাতের বেলা বাইরে থাকতেন। সুজন রাতে কোথায় ছিলেন, জানতে চাইলেই রেশমাকে মারধর করতেন। মাঝে মাঝেই রেশমাকে ঘর থেকে বের করে দিতেন। তখন রাতে রেশমা বাধ্য হয়ে গোয়াল ঘরে ঘুমাতেন। তবে রেশমা নিজের আয় দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের সংসার গুছিয়ে এনেছিলেন। তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর, সংসারের সব জিনিসপত্র তার শাশুড়ি ব্যবহার করেছেন। রেশমার ভাইও দাবি করেছেন রেশমার শ্বশুর-শাশুড়ি ক্রমাগত যৌতুক চাইতেন।

রেশমা সহিংসতা আর সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে আসেন। বাবা-মা বেলতলার ইউপি চেয়ারম্যানের সাহায্য নিয়ে সালিশের মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধের চেষ্টা করেন। রেশমা

নিজে সালিশে যাননি। তার কাছে মনে হয়েছে তার পক্ষ থেকে তার পরিবার সালিশ সভাতে গেলেই চলবে। তাছাড়া সালিশকাররাও জানতেন রেশমা সহিংসতার শিকার। সালিশে সুজনকে সহিংসতা বন্ধ করতে বলা হয়। এরপর রেশমা তার শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলেও সহিংসতা বন্ধ হয়নি। এ ধরনের বেশকিছু সালিশ বসানো হয়। রেশমার পরিবার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বারবার মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সহিংসতার এই চক্র চলমান ছিল।

একপর্যায়ে রেশমা সিদ্ধান্ত নেন সন্তান জন্ম নিলে হয়তো সহিংসতা বন্ধ হবে। কিন্তু মেয়েসন্তান জন্ম দেওয়ায় সহিংসতা আরও বেড়ে গেছে। কারণ তার শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়েসন্তান জন্ম দেওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। রেশমার দুটি সন্তানই তার বাবার বাড়িতে হয়েছে। তার বাবাই যাবতীয় খরচ বহন করেছেন। রেশমার বাবার বাড়িতে থেকেই তার ছেলে স্কুলে যেত। রেশমার বাবাই তার নাতির পড়াশোনার খরচ বহন করতেন। মেয়েটি এখনও স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি।

২০১৫ সালে, সুজন তাকে এতই নৃশংসভাবে পেটায় যে, রেশমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সহিংসতার মাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে রেশমা বলেন,

“

আমাকে এত বেশি মারধর করেছিল যে, গ্রামের অনেকেই বলছিলেন আমি বাঁচব না। একদিনে আমার আয়ু ছয় মাস কমে গিয়েছিল। সে আমাকে হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে পিটিয়েছে যে আমার সারা শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল।

সাক্ষাৎকারের সময় রেশমার এক ভাই মারধরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

“

তাকে [রেশমাকে] খুবই নৃশংসভাবে পিটিয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে পিটিয়ে কালো দাগ ফেলে দিয়েছে। ঝাড়ু দিয়ে তাকে এমনভাবে পিটিয়েছে যে তার গায়ে ঝাড়ুর শলা বিঁধে গেছে।

রেশমার ভাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। তার চিকিৎসা সনদে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তাকে শারীরিক আঘাতের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। যদিও সাব-ইন্সপেক্টর সাইফ রেশমাকে দেখতে এসেছিলেন এবং তার শারীরিক অবস্থার ছবিও তুলেছিলেন, কিন্তু কোনো মামলা হয়নি। তার ভাই জানান, তাদের পরিবার আইনি ব্যবস্থা নেয়নি, কারণ তারা জানতেন না—কী করণীয়।

রেশমা মনে করেন সুজন পুলিশকে ঘুষ দিয়েছেন, সেটাই কারণ। তিনি বলেন,

“

আমরা পুলিশ আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু তাদের টাকা দিয়েছিল [তার স্বামী], তাই পুলিশ কোনো ব্যবস্থা না নিয়েই চলে যায়।

২০১৫ সালে, হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর রেশমার পরিবার সুজনের এলাকার ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে যায় সালিশের জন্য। কিন্তু চেয়ারম্যান আর কোনো সালিশ ডাকতে রাজি হননি। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন, সমঝোতার শর্ত সুজন মানবেন না, তার স্ত্রীকে মারধরও বন্ধ করবেন না। তিনি রেশমার পরিবারকে বলেন, সুজন একটা খারাপ লোক। সহিংসতার মাধ্যমে সুজন তার স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে পারেন। সেই ঝুঁকি বা দায়িত্ব চেয়ারম্যান নিতে চান না। এরপর সুজনের এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান রেশমার এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান হামিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

চেয়ারম্যান হামিমের পরিচালনায় সালিশে সুজন আবারও নির্যাতন বন্ধ ও রেশমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সুজনের কথা যেন ঠিক থাকে—সেই মর্মে চেয়ারম্যান খালি স্ট্যাম্প কাগজে সুজনের স্বাক্ষর নেন। এই স্ট্যাম্প কাগজ রেশমার পরিবারের কাছে আছে। গবেষক দলকে তারা এই কাগজ দেখিয়েছেন। কিন্তু এরপরও সহিংসতা বন্ধ হয়নি। আবারও আগের মতো সহিংসতা থেকে বাঁচতে রেশমা তার বাবার বাড়ি চলে যেতেন। ইউপি চেয়ারম্যানের সালিশের পর আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসতেন। এভাবেই চলতে থাকে।

করোনা অতিমারির কারণে লকডাউনের সময় আরেকটি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। তবে এবার সরাসরি বাবার বাড়িতে না এসে রেশমা তার ফুপুর বাড়িতে চলে যান। এর কারণ তিনি বাবা-মায়ের বোঝা হতে চাননি। পরে তার ভাইকে ফোন করেন। তার ভাই তাকে ২০২০ সালের মাঝামাঝিতে বাবার বাড়িতে নিয়ে আসেন। লকডাউনের সময় যখন রেশমা তার বাবার বাড়ি যান, তখন শুধু তার মেয়েকে সঙ্গে করে আনেন। ছেলেকে স্বামীর কাছে রেখে আসেন। রেশমা তার ছেলের খোঁজ নিতে যখনই সুজনকে ফোন করতেন, সুজন তাকে তালাকের হুমকি দিতেন। সুজন তার ছেলেকে উপহার কিনে দিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে রেশমা খুবই হতাশ হন। ছেলেকে সুজন একটি স্মার্টফোন এবং সপ্তাহে পাঁচশ করে টাকা দেন।

রেশমার পরিবার আবারও হামিম চেয়ারম্যানের কাছে সালিশের জন্য যায়। চেয়ারম্যান আর কোনো সালিশ করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, সুজনকে আদালতে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি বদলাবেন না। তবে রেশমা ও তার পরিবারের মনে হয়েছে—তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সুজনের বিরুদ্ধে মামলার খরচ তারা বহন করতে পারবেন না। রেশমার এক ভাতিজা ব্লাস্টের পটুয়াখালী অফিসের পাশেই মাছ বিক্রি করতেন। তিনি রেশমাকে ব্লাস্টে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রেশমার ভাগনিও স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এরপর ব্লাস্টের সহায়তায় তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার পর নির্যাতন বন্ধ হয়েছে এবং সেই ভাগনি তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন।

২০২০ সালের ১২ অক্টোবর রেশমা ব্লাস্টের অফিসে যান। এরপর ব্লাস্টের বিজ্ঞ আইনজীবী তাকে আইনি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। ব্লাস্ট সমঝোতার জন্য সুজনের কাছে দুটি নোটিশ পাঠায়। কিন্তু তিনি কোনোটিরই উত্তর দেননি। ২০২০ সালের ৯ নভেম্বর ব্লাস্টের প্যানেল আইনজীবী রুবেল খান একটি মামলা দায়ের করেন। ২০১০ সালের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের ১১ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারায় জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিমের আদালতে এই

মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা চাওয়া হয়, যেমন ১৩ নম্বর ধারার আওতায় অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা, ১৪ নম্বর ধারার আওতায় সুরক্ষা আদেশ, ১৫ নম্বর ধারার আওতায় বসবাসের আদেশ এবং ১৬ নম্বর ধারার আওতায় ক্ষতিপূরণ আদেশ। উদ্দেশ্য ছিল রেশমা যেন তার শ্বশুরবাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারেন। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় মামলার বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট রুবেল বলেন, সালিশে সুজন বলেছেন তিনি যৌতুক দাবি করবেন না। পরে রেশমার ওপর যে সহিংসতা চালানো হয়েছে, সেগুলো যৌতুকের দাবিতে নয়। তাই যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় তিনি মামলা দায়ের করতে পারেননি [পরিশিষ্টে দেখুন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পৃষ্ঠা ১৩২]। অন্যদিকে রেশমার চাওয়া ছিল সহিংসতা বন্ধ হবে এবং তিনি তার দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাবেন। রেশমা বলেন,

> “আমি চেয়েছি আমার দুই সন্তান নিয়ে শান্তিতে থাকতে। আমি আমার স্বামীর বাড়ি ছাড়তে চাই না। আমি শুধু চাই আমার স্বামী ভবিষ্যতে আর আমাকে মারধর করবেন না, নির্যাতন করবেন না।

এরপর মামলাটি তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। অনেক সময় দেখা যায়, আদালত থেকে পারিবারিক সহিংসতার মামলাগুলো মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রেশমার এলাকায় উপজেলা কার্যালয়ে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর না থাকায় বেলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি দেখার জন্য দায়িত্ব দেন মাননীয় আদালত। প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন নারী। ব্লাস্ট অনুরোধ করেছিল যেন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আদালত রাজি হননি। ব্লাস্টের উদ্বেগের কারণ ছিল, এ ধরনের তদন্ত পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ নেই। রেশমার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তদন্ত করার পরিবর্তে সালিশের নোটিশ পাঠান। রেশমাকে তার শ্বশুরবাড়িতে ফেরত পাঠানো যায় কি-না, সেই ইচ্ছা ছিল তার। তিনি বলেন, উদ্বেগের কারণ ছিল রেশমার সন্তান ও তাদের ভবিষ্যৎ।

প্রধান শিক্ষিকা সুজনকে ডেকে বলেন, তিনি যেন এমন দুজন ব্যক্তিকে সালিশে নিয়ে আসেন, যারা তার জামিনদার হতে পারবেন। কিন্তু সুজন একা আসেন। সুজন বলেন, যদি প্রধান শিক্ষিকা তার কাছে রেশমাকে ফিরিয়ে দিতে চান, তাহলে তাকে ভরসা করেই সেটা করা উচিত। অন্যথায়, আদালতেই সব মীমাংসা করার কথা বলেন সুজন। সুজনের হয়ে দুজন জামিনদার ছাড়া রেশমার বাবা সুজনের কাছে রেশমাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হননি। ব্যর্থ সালিশের পর, প্রধান শিক্ষিকা আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। ব্যর্থ সালিশে প্রধান শিক্ষিকা সন্তুষ্ট হননি। তিনি রেশমার দুই সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তার মনে হয়েছে মামলা হলে সংসার ভেঙে যাবে। যদি রেশমা ও সুজন অন্যদের বিয়ে করেন, তাহলে সন্তানগুলোর ক্ষতি হবে, বিশেষ করে রেশমার মেয়ের। রেশমা তালাকপ্রাপ্ত হলে তার মেয়ের বিয়ে দিতেও সমস্যা হবে। কারণ তালাকপ্রাপ্ত নারীর ব্যাপারে সমাজে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

মামলার শুনানির জন্য আদালতের তারিখ ধার্য করা হয় ২০২১ সালের ১৬ মার্চ। সুজন জামিনের জন্য আবেদন করেন এবং জামিন পান। এরপর মামলাটি মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে হস্তান্তর করা হয়। ২০২১ সালের ২০ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে দেশে আবারও লকডাউন শুরু হয়। আগস্ট মাস পর্যন্ত সশরীরে আদালত বসা বন্ধ থাকে। এই মামলার ক্ষেত্রে অনলাইনে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ ব্লাস্ট পায়নি।

২০২১ সালের লকডাউনের সময় রেশমার ছেলে তার বাবার পক্ষ হয়ে তাকে ফোন করতো। ফোন করে তাকে বাড়ি ফিরে আসতে বলত। সুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কারণে সুজন রেশমাকে কটাক্ষ করতেন। রেশমা কেমন আছেন সে বিষয়ে কোনো কিছু সুজন জিজ্ঞেস করতেন না। এর পরিবর্তে, সুজন তাকে মামলা করার কারণে তালাক নিয়ে নিতে বলেন। সুজন এ-ও বলেন, যদি রেশমা ফিরে না আসে তাহলে যেন তালাক দিয়ে দেয়। রেশমা জবাব দেন সুজন যদি তালাক চায়, তাহলে সে-ও তালাক দিতে রাজি আছেন।

২০২১ সালের মার্চ মাসে ব্লাস্টের অফিসে একটি বৈঠক হয়। রেশমা ও সুজন দুজনই উপস্থিত ছিলেন। তাদের ছেলে বাবার (সুজনের) পক্ষ নেয়। ব্লাস্টের জেলা পর্যায়ের সমন্বয়কারী ছিলেন একজন আইনজীবী। তিনি বলেন, বাড়তি টাকা হিসেবে তারা পাঁচ লাখ টাকা দাবি করবেন। কারণ রেশমার অতীতের ভরণপোষণের খরচও দিতে হবে। রেশমার চিকিৎসার খরচ, তার সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং বারবার যেহেতু রেশমাকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তাই সেসব খরচও বহন করতে হবে সুজনকে। দেনমোহরের চেয়ে বাড়তি টাকা দাবি করায় সুজন জানান তিনি আদালতের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন। যেহেতু সুজন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের প্রক্রিয়া মানতে রাজি হননি, তাই ব্লাস্টের সমন্বয়কারী সিদ্ধান্ত নেন ভরণপোষণের জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৫ নম্বর ধারার আওতায় মামলা করবেন (আইনি ভাষ্য ১৭ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৭

সংসার টিকিয়ে রাখতে যেসব কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার মধ্যে একটি হলো বিজ্ঞ আইনজীবীরা পারিবারিক এসব মামলায় ফেরতযোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। এর মধ্যে দেনমোহরের টাকা, অতীতের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের টাকা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, স্বামী যেন বাড়তি টাকা দেওয়ার দায় থেকে রেহাই পেতে বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চান। এর ফলে দেখা যায়, যে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে সমঝোতা করে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনেন। বিয়ের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এই কৌশল কাজে লাগে (যদিও পরিষ্কার নয় যে এর ফলে সহিংসতা বন্ধ হয় কি-না)।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুল পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। তখন রেশমার মেয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করে। স্কুলটি ছিল সুজনের এলাকায়। সেপ্টেম্বর মাসে রেশমা তার মেয়েকে স্কুলে দিতে গেলে সুজনকে সেখানে দেখতে পায়। স্থানীয় লোকজন এবং অন্যান্য মুরুব্বিরা তাকে চাপ দেন যেন সুজনকে ক্ষমা করে দিয়ে তিনি আবারও ফিরে আসেন। সুজনও তাকে ফিরে আসতে জোরাজুরি করেন। এ ব্যাপারে রেশমা জানান, তিনি এত মানুষের কথা ফেলতে না পেরে সুজনের কাছে ফিরে আসেন। দুই দিন পর সুজন আবারও রেশমাকে মারধর করেন। রেশমার ছেলেও তার বাবার নির্দেশে তাকে মারধর করে। ছেলের হাতে মার খেয়ে তিনি ভয়ানক হতাশ হন। তখন তিনি আবার বাবার বাড়ি ফিরে আসেন। বিভিন্ন উপহার দিয়ে সুজন কৌশলে ছেলেকে তার নিজের পক্ষে নিয়ে রেশমাকে অপমান করায়। এর ফলে অল্প বয়সী ছেলের যে ক্ষতি করা হয়, তা-ও উদ্বেগের বিষয়।

উপসংহার

সালিশের মাধ্যমে সমঝোতার সব পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন রেশমা ও তার পরিবার আশা করে আদালতের মাধ্যমে তারা সমস্যার সমাধান করবেন। অর্থাৎ রেশমা তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবেন এবং সুজন সহিংসতা বন্ধ করবেন। এই আশায় ব্লাস্ট পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তবে এই আইনের আওতায় বিবাদীকে আদালতে হাজির করা কঠিন যেহেতু আইনটি দেওয়ানি। এই আইনে ফৌজদারি বিধি তখনই প্রয়োগ হয় যদি আদালতের আদেশ ভঙ্গ করা হয়, অন্যথায় নয়। রেশমার ক্ষেত্রে, তার স্বামীর দিক থেকে সহযোগিতা না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া বা সালিশ, কোনোটির মাধ্যমেই সমঝোতা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে, ২০২১ সালের ২৪ মার্চ ব্লাস্ট সুজনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় আরেকটি মামলার আশ্রয় নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, সুজন যেন রেশমাকে ফিরিয়ে নেন এবং রেশমা ও তার পরিবারের যেসব আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেন। দুটি মামলাই বর্তমানে চলমান রয়েছে।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

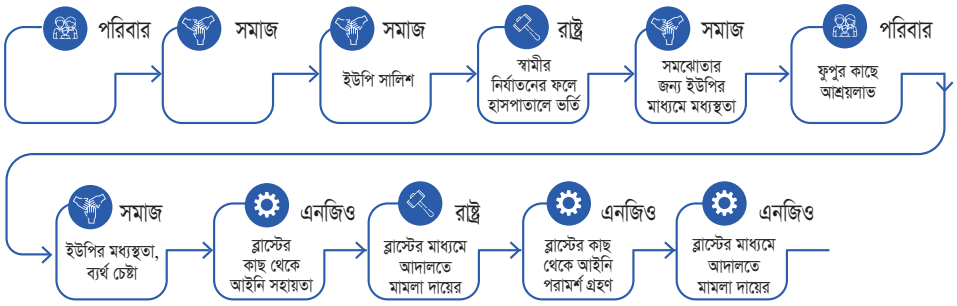

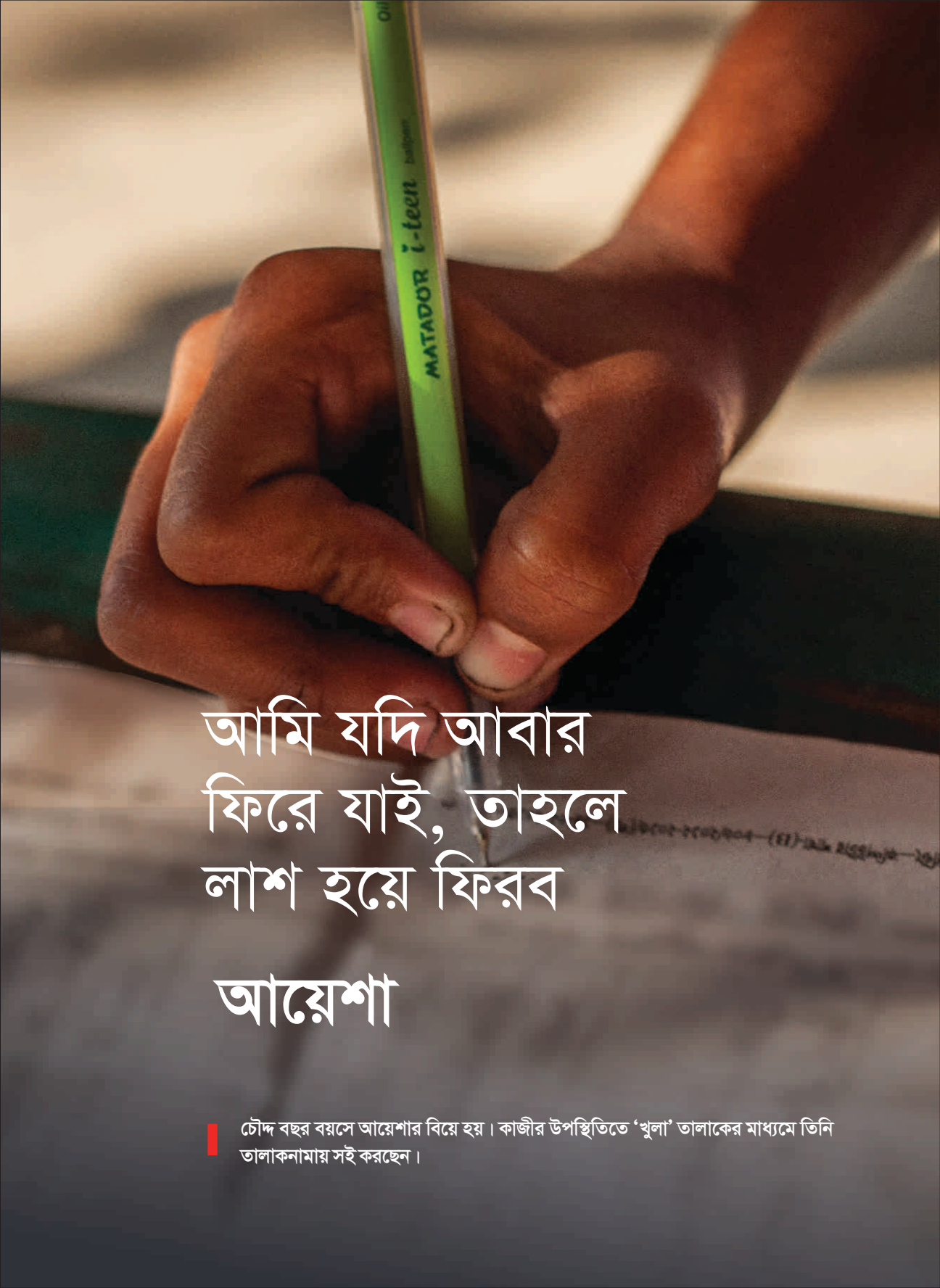

আমি যদি আবার ফিরে যাই, তাহলে লাশ হয়ে ফিরব

আয়েশা

চৌদ্দ বছর বয়সে আয়েশার বিয়ে হয়। কাজীর উপস্থিতিতে ‘খুলা’ তালাকের মাধ্যমে তিনি তালাকনামায় সই করছেন।

ঠ. আমি যদি আবার ফিরে যাই, তাহলে লাশ হয়ে ফিরব –আয়েশা

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাল্যবিয়ে, যৌতুক, হত্যাচেষ্টা, ইউপির নেতৃত্বে মধ্যস্থতা

ভূমিকা

আয়েশার বাড়ি রংপুর। তার বয়স ষোলো বছর। চৌদ্দ বছর বয়সে যখন তার সম্মতি দেওয়ারও বয়স হয়নি, তখন করিমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের শুরু থেকেই তার ওপর চরম সহিংসতা চালানো হয়েছে। তার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদ তার ওপর শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা চালান। যৌতুকের দাবিতে তাকে মারধর, চড়-থাপ্পড় এবং অপমান করা হয়। একবার তার স্বামী তাকে প্রায় খুন করেই ফেলেছিলেন। তাকে বেঁধে গলার রগ কেটে ফেলার চেষ্টা করা হয়। বেশকিছু সালিশ চেষ্টার পর এখন তিনি তালাক নিয়ে তার মা ও নানির সঙ্গে বসবাস করছেন। তার পরিবারের ডাকা সালিশের মাধ্যমে তিনি দেনমোহরের টাকা ফেরত পেয়েছেন। এখন তিনি আবার পড়াশোনা শুরু করেছেন। আয়েশা বর্তমানে নবম শ্রেণিতে পড়ছেন।

বৃত্তান্ত

আয়েশার মা মানুষের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন। তারা বাবা কাজ করতেন দিনমজুর হিসেবে। একসময় তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তার বাবা দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। তার বড় বোনও বিবাহিত। আয়েশা তার মায়ের সঙ্গে টিনের একটি এককক্ষের ঘরে নানির বাড়িতে থাকতেন। আয়েশার নানি ও মামা তাকে থাকার জায়গাসহ তাদের পারিবারিক সহায়তা দিয়েছেন। ২০১৯ সালে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিশ বছর বয়সী রাজমিস্ত্রি করিমের সঙ্গে আয়েশার বিয়ে হয়। বিয়ের পর আর আয়েশা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। অন্যদিকে তার স্বামী করিম কখনোই স্কুলে যাননি। করিমের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল না। তার

বাবা রিকশাচালক ছিলেন। চার শতক জায়গার ওপর নির্মিত তিন কক্ষের একটি টিনের বাড়িতে তারা থাকতেন। করিমদের এটুকুই সম্পত্তি ছিল। আয়েশার বিয়ের কাবিননামা দেখতে চাইলে তিনি ও তার মা তা দেখাতে পারেননি। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না আদৌ বিয়ের নিবন্ধন হয়েছিল কি না।

কেস

বিয়ের সময় আয়েশার দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল এক লাখ বিশ হাজার টাকা। করিমের পরিবার যৌতুক দাবি করেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। আয়েশার মায়ের যেহেতু সামর্থ্য ছিল না, তাই সিদ্ধান্ত হয় বিয়ের এক বছরের মধ্যে যৌতুকের দাবি মেটানো হবে। আয়েশার পরিবার সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিয়ের সময় দিয়ে দেয়। এগুলো যৌতুকের অংশ ছিল না। আয়েশার বাবা বিয়েতে এসেছিলেন। কিন্তু কোনো আর্থিক সহায়তা করেননি। তাই যৌতুকের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রেও খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল আয়েশার এক আত্মীয়ের দিক থেকে। তবে বিয়ের সময় আয়েশার পরিবার জানত না যে করিম এর আগে দুবার বিয়ে করেছেন।

যদিও করিমের পরিবার যৌতুকের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পরপরই তারা আয়েশার মায়ের কাছে যৌতুকের টাকা দাবি করা শুরু করেন। বিয়ের মাত্র দশ দিন পরই আয়েশার শাশুড়ি ও ননদ যৌতুকের টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে না পারায় তারা আয়েশাকে মারধর করেন। আয়েশার শ্বশুরবাড়ির সব কাজ তাকে দিয়েই করানো হতো। তার শাশুড়ি কাজে সন্তুষ্ট না হলেই তাকে মারধর করতেন। প্রথম থেকেই যৌতুকের দাবিতে আয়েশার ওপর সহিংসতা শুরু হয়। কিন্তু আয়েশার স্বামী নিজের মা ও বোনকেই সমর্থন করতেন। তিনি কোনো প্রতিবাদ যেমন করেননি, তেমনি সহিংসতা বন্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেননি। আয়েশাকে তার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিতেন না করিম। মারধরের ঘটনার পাঁচ-ছয় দিন পর আয়েশা গোপনে তার স্বামীর ফোন থেকে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্যাতনের কথা জানান। আয়েশার মা তখন আয়েশার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নির্যাতনের বিষয়ে কথা বললে—এ নিয়ে তর্ক হয়। তবে সহিংসতা বন্ধ হয়নি। আয়েশার মা আয়েশা ও করিমকে দাওয়াত খেতে আয়েশাদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে আসেন। করিম সেখানে আয়েশাকে রেখে নিজের বাড়ি চলে যান। আয়েশা আট মাস তার নানির বাড়িতে থাকেন। যখনই আয়েশা তার স্বামীকে বলতেন তাকে নিয়ে যেতে, তার স্বামী বলতেন সে যেন একাই চলে আসে। কিন্তু আয়েশা একা যেতে রাজি হননি। আয়েশার মায়ের মতে, একা স্বামীর বাড়ি যাওয়া ভালো দেখায় না। এর ফলে পরিবারের বদনাম হবে, যেহেতু আয়েশার নতুন বিয়ে হয়েছে। তাছাড়া আয়েশা একা চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিলেন না। চলাফেরায় তার শঙ্কাও ছিল। আয়েশার একা শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাওয়ার পেছনে বিয়ের ঠিক পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের দাবিতে সহিংসতার পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। আয়েশার একা যেতে রাজি না হওয়ার বিষয়টি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভালোভাবে নেননি।

তাই আয়েশার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সালিশের মাধ্যমে আয়েশাকে ফিরিয়ে আনতে ইউনিয়ন পরিষদে যান। দুই পরিবার একই ইউনিয়নের বাসিন্দা। সালিশে যৌতুক ও নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক সালিশ পরিচালনা করেন। তিনি আয়েশাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব নিয়ে বলেন, সালিশের পর যদি কিছু ঘটে—এর দায়িত্ব তিনি নেবেন। সালিশে সিদ্ধান্ত হয়, এই দম্পতি আলাদা সংসার শুরু করবে (যদিও আয়েশা খুবই অল্পবয়সী একটি মেয়ে)। এই সিদ্ধান্তের পেছনে স্পষ্ট যুক্তি ছিল না। চেয়ারম্যান ফারুক স্বীকার করেছিলেন এটি বাল্যবিয়ের ঘটনা। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে শুধু আয়েশার পরিবারকেই দায়ী করেন। তার প্রশ্ন, কীভাবে আয়েশার পরিবার এত ছোট একটি মেয়েকে বিয়ে দিল। কিন্তু ইউনিয়ন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানের ভূমিকা ও দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেননি। তবে বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না (আইনি ভাষ্য ১৮ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৮

২০১৮ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা [অধ্যায় ১৫(১)] অনুযায়ী ইউনিয়ন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি শুধু বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বিয়ে বন্ধ করতে পারে, কিংবা ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে (৫ নম্বর ধারা) আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মাননীয় আদালত বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। তবে বিধির কোথাও বলা নেই, বাল্যবিবাহে জড়িত পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর মামলা করা যাবে না। "ইউনিয়ন কমিটির প্রধান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এর সদস্য থাকবেন সকল ওয়ার্ড সদস্য, কাজী এবং চেয়ারম্যানের বাছাই করা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসার উপদেষ্টা বা অধ্যক্ষ এবং বাল্যবিবাহ বা নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওর দুজন প্রতিনিধি। এই কমিটি মাসে অন্তত একবার বৈঠক করবে এবং উপজেলা পর্যায়ে তাদের কাজের মাসিক প্রতিবেদন জমা দেবে। এই কমিটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করবে এবং উপজেলা কমিটির কাছে সুপারিশ প্রদান করবে। এছাড়াও এই কমিটি প্রতি বছরের শুরুতে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে (ইয়াসমিন, ২০২০)।"

বাল্যবিবাহের কথা বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান ফারুক বলেন, তার অগোচরে এবং ইউনিয়নের বাইরে এসব ঘটনা ঘটে। বাল্যবিবাহের ঘটনায় তিনি অভিভাবকদের দোষারোপ করেন। চেয়ারম্যান যখন বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে বলে জানতে পারেন, তখন তারা অন্য ইউনিয়নে গিয়ে গোপনে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে ফেলেন। অনেক সময় এসব বিয়ে টিকে না।

সাধারণভাবে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাসংক্রান্ত সালিশে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান এসব সালিশের মাধ্যমে বিয়ে টিকিয়ে রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তার মতে,

এটাই একমাত্র সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিকল্প। এছাড়াও সালিশের শুনানিগুলো লিপিবদ্ধ করার গুরুত্বও তুলে ধরেন, যাতে প্রয়োজন হলে পরবর্তী সময়ে আদালতে ব্যবহার করা যায়।

> সমঝোতার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো পরবর্তীকালে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো এবং দ্বিতীয়টি হলো বিয়ে টিকিয়ে রাখা। আমরা দুটিই নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। আমরা এমনভাবে নথিপত্র রাখি যেন ভবিষ্যতে বাদী বা বিবাদী কিংবা ভুক্তভোগী যে-ই হোক না কেন, তিনি যেন আমাদের নথিপত্র ব্যবহার করে আইনি সহায়তা নিতে পারেন।
>
> —ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক

বাড়ি ফিরে আসার পর আয়েশার শ্বশুরবাড়িতে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে প্রথম রাত চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী আলাদা থাকতে দেওয়া হয়। আয়েশা যখন আলাদা সংসার শুরু করতে গেলেন, তখন তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেননি। তাই সবকিছুই তিনি তার মায়ের বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন।

একটি বিষয় চোখে পড়ে, আয়েশার মা সংসারের যত বেশি জিনিসপত্র নিয়ে অভিযোগ করেছেন, সে তুলনায় তার মেয়ের বিরুদ্ধে ঘটে চলা সহিংসতা নিয়ে অভিযোগ করেননি। বিয়ের পর আয়েশার ওপর চালানো যৌন নির্যাতন প্রত্যাশিত ধরে নেওয়া হয়েছে। তার যৌনইচ্ছা বা সম্মতির ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ ছিল বলে মনে হয়নি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরও আয়েশার ওপর সহিংসতা বন্ধ হয়নি। তার স্বামী এরপরও তাকে মারধর চালিয়ে গেছেন। তিনি আয়েশাকে তার মা বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না। আয়েশা মনে করতেন, তার শাশুড়ি আর ননদই এসব সহিংসতার জন্য দায়ী। আয়েশার ননদের স্বামী বিদেশে থাকতেন। তাই তার ননদ বাবার বাড়িতেই থাকতেন। তাছাড়া আয়েশার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে চাপ দিতেন, যেন তিনি তাড়াতাড়ি সন্তান নিয়ে নেন। কিন্তু আয়েশা জানান তিনি রাজি হননি, কারণ তিনি জানতেন গর্ভবতী হওয়া বা সন্তান নেওয়ার মতো বয়স তার হয়নি। এ বিষয়ে জোর করার পর তিনি রাজি না হলেই তাকে মারধর করা হতো।

ইতোমধ্যে আয়েশা জেনে গেছেন তার স্বামী আগেও বিয়ে করেছিলেন—আয়েশা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরে সংসার টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজেকে বোঝান যে, অনেক সময় নারীরা তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসেবেও সংসার করেন। এভাবে তিনি মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

পরবর্তী সময়ে ২০২০ সালের রমজান মাসের শেষে আয়েশার মা ও বোন ঈদ উপলক্ষে তার জন্য জামাকাপড় নিয়ে আসেন, আয়েশার শ্বশুরবাড়ির জন্য ইফতার আনেন। এছাড়াও ঈদ উপলক্ষে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে যান। ঈদের আগে মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে উপহার দিয়ে আসা একটি সামাজিক চর্চা। আয়েশার মা নিজেও এই চর্চার অংশ হিসেবে গিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি

একমাস নিজের মেয়েকে দেখতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। যদিও পুরো দেশে তখন লকডাউন চলছিল, কিন্তু এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াতে কোনো সমস্যা হতো না। আয়েশার মা ও বোন যখন আয়েশার শ্বশুরবাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন আয়েশার শাশুড়ি ও ননদসহ একজন প্রতিবেশী এসে তাদের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। আয়েশার মা আয়েশাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেই তিনি নিজেও মারধরের শিকার হন।

এরপর সেদিন আয়েশার চাচারা তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শুনতে পান কী ঘটেছিল। আয়েশার মা তখনই একটি সালিশ ডাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়েশার চাচা মত দেন যে, একজন সালিশকার আনতে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ হবে। তাই তিনি পরে সালিশ ডাকার পরামর্শ দেন। এরপর আয়েশার মা আয়েশাকে তার শ্বশুরবাড়িতে সেদিন রেখে আসেন।

২০২০ সালের ২৩ মে সালিশকার হিরনের সাহায্যে আয়েশার মামা তানভির একটি অনানুষ্ঠানিক সালিশের বন্দোবস্ত করেন। এর তিন দিন পর আয়েশার মা আবারও আয়েশার শ্বশুরবাড়ি যান। হিরন কলেজের একজন শিক্ষক। তার বাড়ি পলাশপাড়ায়। শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজের মানুষ তাকে সালিশকার হিসেবে সম্মান করে। বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তিনি সালিশ পরিচালনা করে থাকেন। এরপর আয়েশার শ্বশুরবাড়ি পলাশপাড়ায় সালিশ বসানো হয়েছিল। আয়েশা, তার মা ও বোনকে মারধরের ঘটনায় আয়েশার পরিবার এই সালিশ ডেকেছিলেন। আয়েশার মা, তার মামা তানভির এবং আয়েশার নানিসহ বেশ কয়েকজন সেদিন সকালে আয়েশার শ্বশুরবাড়ি আসেন। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন যে আয়েশাকে ঘরে তালাবন্দি করে রাখা হয়েছে। আয়েশার নানি দরজা খুলতে ধাক্কা দেন। আয়েশা যখন বের হয়ে আসেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। আয়েশার মা কান্নার কারণ জানতে চাইলে আয়েশা ভয়ে কিছুই বলেননি।

সালিশের সময় আয়েশা সবাইকে জানান, কীভাবে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন সালিশ শুরু হওয়ার একটু আগে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বুঝতে পারেননি যে আয়েশার পরিবার সালিশের নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে আসবে। সবার সামনে আয়েশা বর্ণনা দেন, কীভাবে করিম তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন,

> “ওড়না দিয়ে সে আমার হাত-মুখ বেঁধে ফেলে। দড়ি দিয়ে আমার পা বাঁধে। এরপর সে আমাকে জবাই করতে একটি বঁটি হাতে নেয়। আমার পেটে সে বঁটি চেপে ধরে। আমি ভেবেছিলাম আমার জীবন এখানেই শেষ।

করিমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আয়েশাকে হত্যাচেষ্টার কথা স্বীকার করেন।

হিরন তার নিজস্ব যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে জানতে পারেন যে আয়েশা করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী নয় বরং তৃতীয় স্ত্রী। এ বিষয়টি তিনি সালিশে আয়েশার পরিবারকে জানান। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন

মানুষ সালিশে উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই বলেন আয়েশার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানুষ হিসেবে ভালো নয়। এসব শুনে হিরন আয়েশার মাকে পরামর্শ দেন তিনি যেন আয়েশাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যান। আয়েশা সংসার করবে কি করবে না, তা পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। তবে আয়েশার পরিবারের জন্য এটি একটি বাঁকবদল করার মতো ঘটনা ছিল। তারা আয়েশাকে আর করিমের কাছে পাঠাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আয়েশাকে আয়েশার মা নিজের মায়ের বাড়ি, অর্থাৎ আয়েশার নানির বাড়িতে নিয়ে আসেন।

সালিশের পর কয়েক মাস পার হয়ে যায়। কিন্তু আয়েশার বিয়ে নিয়ে আর কোনো আলোচনা হয়নি। আয়েশার মা তার ভাই তানভিরের কাছে সাহায্য চান। করিমের সঙ্গে বিয়ের দুই বছরে মাত্র এক মাস করিমের বাড়িতে ছিলেন আয়েশা। তার পরিবারের কেউই চাননি এই বিয়ে টিকে থাকুক। আয়েশার মামা তানভির রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। যদিও তিনি সরাসরি রাজনীতি করতেন না, কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের লোকদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন। সেজন্য স্থানীয়ভাবে তার প্রভাব ছিল। হিরনের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। আয়েশা বলেন,

> “
> শুরুতে আমি যেতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে আর রাজি হইনি। আমি যদি আবার ফিরে যাই, তাহলে লাশ হয়ে ফিরব।

যদিও আয়েশা তার বিয়ের প্রত্যাশার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলেননি, কিন্তু তার মা আশা করেছিলেন বিয়ের পর করিম আয়েশার প্রতি অনুরক্ত থাকবে। আয়েশার মা সাক্ষাৎকারের সময় জানান আয়েশার প্রতি করিমের কোনো ভালোবাসাই ছিল না।

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে হিরনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তানভির একটি চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা একমত হতে পারেননি, কারণ আয়েশার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কোনো আগ্রহ দেখাননি। এরপর তানভির পরামর্শ দেন যেন বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয়। এছাড়াও তানভির আরডিআরএসের কমিউনিটি অ্যানিমেটর তথা রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক সিদ্দিকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বলেন। কারণ তিনি আগেও একই ধরনের বিষয়ে সিদ্দিকের পরামর্শ নিয়েছেন। ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তাদের যখন দেখা হলো, তানভির তখন সিদ্দিককে ঘটনা খুলে বলেন। কিন্তু আয়েশাকে করিমের হত্যাচেষ্টার ঘটনা বলেননি।

তানভিরের কাছে সিদ্দিক জানতে চান, আয়েশার পরিবার সালিশ চায় কি-না। তানভির জানান আয়েশার পরিবার দেনমোহরের টাকা উদ্ধার করতে চায়। সিদ্দিকের মনে হয়েছে আয়েশার পরিবার আইনি সহায়তায় আগ্রহী নয়। তানভিরের সঙ্গে কথা বলে সিদ্দিক আয়েশার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। আয়েশার মায়ের সঙ্গে কথা বলে হত্যাচেষ্টার কথা শোনার পর সিদ্দিক বুঝতে পারেন তারা পুলিশি মামলা করতে চাচ্ছেন না। অথচ আয়েশা প্রায় খুন হতে যাচ্ছিলেন! আয়েশার মা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—তারা মনে করেন পুলিশকে যুক্ত করলে অনেক টাকাপয়সা খরচ হবে। তাছাড়া এর একটা সামাজিক ক্ষতিও আছে বলে তিনি মনে করতেন।

তার মতে, আয়েশা এখনও অনেক ছোট। তাকে আবার বিয়ে দেওয়া সম্ভব। আদালতে গেলে পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। কারণ, সমাজ সবসময়ই নারীদের দুর্ভাগ্যের জন্য নারীদেরই দোষারোপ করে। আয়েশার মায়ের কাছে আয়েশার ওপর চালানো প্রচণ্ড শারীরিক সহিংসতার চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোর বিবেচনাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

সিদ্দিক ও হিরন মিলে করিম ও তার পরিবারের সঙ্গে টাকার ব্যাপারে কথা বলেন। করিমের পরিবার মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়। কিন্তু আয়েশার পরিবার তা মানেনি। কারণ, বিয়ে ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে তারা প্রায় ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন। সিদ্দিক আয়েশার মাকে ইউনিয়ন পরিষদে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানে যদি কাজ না হয় তাহলে 'সরকারি আইনগত সহায়তা' নিতে পরামর্শ দেন, কারণ সেখানেও মামলা করার আগে মধ্যস্থতা করা হয়।

আয়েশার মা ২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি পলাশপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফারুকের কাছে যান, অর্থাৎ যে ইউনিয়নে করিমের বাড়ি। যদিও আগে তিনি দুবার চেয়ারম্যান ফারুকের কাছে গেছেন; কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সালিশের ব্যবস্থা করা হয়নি। সালিশের জন্য নোটিশ পাঠানো ইউনিয়ন পরিষদের একটি সাধারণ দায়িত্ব। আয়েশার মা ইউনিয়ন পরিষদে যেতে চেয়েছেন, কারণ চেয়ারম্যান ফারুক প্রথম সালিশ পরিচালনা করেছিলেন। কিছু ঘটলে ফারুক দায়িত্ব নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আয়েশার মা বলেন,

> "আমি গিয়েছিলাম কারণ তিনি একবার আমার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছেন; [আমার উচিত] তাকে আবার জানানো। কারণ তিনি বলেছিলেন, 'আপনার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি ফেরত পাঠান। কিছু ঘটলে আমাকে জানাবেন।' সুতরাং চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি ব্যাপারটি দেখবেন না? মেয়েটি এখানে নয় মাস ছিল। মেয়ের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি-না, তা দেখা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নয়? তাই আমি চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম।

আয়েশার ওপর সহিংসতা বন্ধ করা থেকে শুরু করে তালাকের আপসরফায় আরও বেশি দেনমোহরের টাকা আদায়– প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়েশার মা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও আয়েশার মা মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং তার ভাই তানভিরের সমাজে প্রভাবশালী অবস্থানের মতো বিষয়গুলো কাজে লাগান। সাক্ষাৎকারে আয়েশার মা বলেছিলেন, তিনি আরও বেশি দেনমোহরের টাকা আদায়ের জন্য চেষ্টা করছেন। কারণ পরবর্তীকালে এই টাকা দিয়ে আয়েশাকে আবার বিয়ে দেওয়া যাবে। এখান থেকে বোঝা যায় পরিবার ও সমাজের চোখে নারীর বিয়েকেই একমাত্র সম্মানজনক পথ হিসেবে দেখা হয়। অথচ বিয়ের কারণে আয়েশা ভয়ানক এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। নারীদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প অবলম্বন না থাকায়—বিয়ের বাইরে নারীর অন্য কোনো ভবিষ্যৎ কল্পনাও করা হয় না।

দেনমোহরের টাকা উদ্ধারে হিরন করিমের পরিবারের সঙ্গে দেনদরবার চালিয়ে যান। করিমের পরিবার যেহেতু কোনো সহায়তা করছিল না, তাই হিরন আয়েশার পরিবারের মামলার প্রস্তুতির খবর জানান। আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের হুমকি অনেক সময় আদালতের বাইরে সমঝোতা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কারণ আদালতে গেলে দীর্ঘসূত্রতা, মামলায় আটকে যাওয়া, অন্য কাজে সময় দিতে না পারা, বিপুল খরচ এবং মানসিক চাপের কারণে মানুষ সমঝোতা করতে রাজি হয়। এর ফলে করিমের পরিবার সমঝোতা করতে চাপ বোধ করে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে দুই পরিবারই রাজি হয় যে করিমের পরিবার আয়েশার পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে এবং বিয়ের সময় আয়েশার পরিবারের দেওয়া আসবাবপত্র ও থালাবাসন ফিরিয়ে দেবে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি হিরনের বাড়িতে আয়েশা তালাকনামায় স্বাক্ষর করেন। কাজীর উপস্থিতিতে খুলা তালাক সম্পন্ন হয় (আইনি ভাষ্য ১৯ দেখুন)।

আইনি ভাষ্য ১৯

'খুলা' তালাক এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নারী মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে তার স্বামীকে যখন ইচ্ছা নিজের সম্মতিতে তালাক দিতে পারেন। যেসব ঘটনায় স্ত্রীকে খোলাখুলিভাবে তালাক দেওয়ার অধিকার স্বামীর ওপর অর্পিত নয়, সেখানে এই প্রক্রিয়া সাধারণত ব্যবহৃত হয়, যেমনটি কাবিননামার ১৮ নম্বর ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। খুলা তালাকের মাধ্যমে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী বিয়ে থেকে বের হয়ে যেতে স্বামীকে সম্মতি দেয়। যদিও দেনদরবারের শর্ত স্বামী ও স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে, কিন্তু স্ত্রী বিবেচনা হিসেবে তার দেনমোহরের টাকা ও অন্যান্য অধিকার ত্যাগ করতে পারেন কিংবা স্বামীর সুবিধার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন। সাধারণত দেখা যায়, একজন নারী শুধু তালাক পেতে বা বিয়ে থেকে বের হয়ে যেতে কাবিননামায় বর্ণিত দেনমোহরের টাকা মওকুফ বা কমাতে রাজি হয়। এই প্রক্রিয়ায় স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই তালাকনামায় সই করতে হয়। স্ত্রীর সই হলো তার সম্মতির প্রমাণ। যেসব তালাকে স্ত্রীর লিখিত বা অন্য কোনো ধরনের সম্মতির প্রয়োজন নেই, সেখানে এটি প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে শুধু একটি নোটিশ পাঠানোই যথেষ্ট।

সালিশে নিজের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে হিরন বলেন, তিনি নিজে সালিশকে সফল মনে করেন না। কারণ তিনি দম্পতিদের সালিশ পরিচালনা করে থাকেন বিয়ে টিকিয়ে রাখার আশায়। যেহেতু আয়েশার বিয়ে টেকেনি, তাই হিরন এই সালিশকে সফল মনে করেন না।

আয়েশার পরিবার এই সালিশের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। কারণ তারা আয়েশাকে জীবিত ও অক্ষত ফিরে পেয়েছেন। তবে আয়েশার মা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ভূমিকায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ চেয়ারম্যানই আগে তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে আয়েশা যদি আবার সহিংসতার শিকার হন, তাহলে তিনি বিষয়টি দেখবেন। আয়েশা আবার স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছেন। তার স্কুলজীবন থেকে দুই বছর খোয়া গেছে, যদিও এ সময়ের অনেকটাই

করোনা অতিমারির কারণে স্কুল বন্ধ ছিল। তবে তার স্কুল শিক্ষকরা তাকে সহযোগিতা করেছেন। দেনমোহরের টাকাসহ বিয়ের সময় দেওয়া আসবাবপত্র ও থালাবাসন আয়েশা ফিরে পেয়েছেন। বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী সালিশ পরিচালনা ও করিমের পরিবারের সঙ্গে দেনদরবার করার বিনিময়ে আয়েশার পরিবার হিরনকে দশ হাজার টাকা প্রদান করেছে। তালাকের কাগজপত্র হিরনের বাসায় রাখা হয়েছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা অতিমারির কারণে আরোপিত লকডাউনের মধ্যেই সব সালিশ ও দেনদরবার হয়েছে। কিন্তু সাক্ষাৎকারে কেউ বলেননি যে, লকডাউনের কারণে তাদের চলাফেরা বা কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার

আয়েশার ঘটনায় বাল্যবিবাহের বিপদ কেমন হতে পারে, তার বাস্তব চিত্র দেখা যায়। এছাড়াও দেখা যায় সামাজিক পর্যায়ের সালিশগুলোয় বাল্যবিবাহকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। শুধু অল্পকিছু ক্ষতিপূরণ আদায়েই এসব সালিশের মনোযোগ থাকে। বাল্যবিবাহে যেসব পক্ষ যুক্ত ছিল, তাদের ভুল কাজের কথা বলা হয় না কিংবা তাদের জবাবদিহি চাওয়া হয় না। বিয়ে ভাঙতে কোনো আইনি প্রতিকার কাজে লাগানোর চেষ্টাও দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব কিংবা আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো বিয়ে ভেঙে যাওয়ার 'সামাজিক কলঙ্কের' ভয়। আর্থিক বিবেচনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আইনি প্রতিকার পেতে গেলে খরচের পাশাপাশি নতুন করে বিয়ে দিলেও খরচ হবে। এই ঘটনা থেকে সালিশে মেয়ে বা নারীকে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও দেখা যায়। আয়েশাকে যে প্রায় খুন করেই ফেলা হয়েছিল, এ কথা একমাত্র তখনই তিনি সবাইকে বলতে পেরেছিলেন, যখন তার আত্মীয়স্বজনরা পাশে ছিলেন।

সমাজে সালিশ অনেক বেশি সহজলভ্য হওয়ার কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিনা খরচে হয় না। এসব সালিশে সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি এসব সালিশে সহিংসতা ও নির্যাতনের ব্যাপারেও আপস করা হয়। একজন নারীর একা বসবাস করা, নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সমাজে যেসব কলঙ্কের ধারণা বিদ্যমান, এসব সালিশে সেসব কলঙ্কের যথার্থতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া যৌন ও শারীরিক সহিংসতার বিষয়টি পরিবারে কিংবা সমাজে প্রকাশ করা হয়নি, এমনকি তা জানা গেলেও স্বীকার করা হয়নি।

ন্যায়বিচারের অভিযাত্রা

আয়েশা স্কুলে যাচ্ছে

তথ্যসূত্র

Sultan, M., Akter, M., Mahpara, P., Pabony, N. A., & Tasnin, F. (2021a). Access to justice during COVID-19 for survivors of domestic violence. BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University. https://bigd.bracu.ac.bd/publications/access-to-justiceduring-covid-19-for-survivors-of-domestic-violence/

Sultan, M., Akter, M., Mahpara, P., Pabony, N. A., & Tasnin, F. (2021b). Access to justice during COVID-19 for survivors of domestic violence [Policy brief]. BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University. https://bigd.bracu.ac.bd/publications/access-to-justiceduring-covid-19-for-survivors-of-domestic-violence-policy-brief/

Siddiqi, M. D. (2003). Shalish and the quest for gender justice: An assessment of strategic intervention in Bangladesh. Research Initiative Bangladesh.

Islam, M. S., & Alam, M. S. (2018). Access to justice in rural Bangladesh: A review on village court and its effectiveness. Asian Studies, Jahangirnagar University Journal of Government and Politics, 37, 31–44.

Yasmin, T. (2020). A review of the effectiveness of the new legal regime to prevent child marriages in Bangladesh: Call for law reform (p.24). Plan International Bangladesh & Girls Not Bride Bangladesh. https://plan-international.org/file/46276/download?token=fu7fdGCh

ব্লাস্টের একজন স্টাফ এবং একজন প্যারালিগ্যাল থানার দিকে যাচ্ছেন।

শব্দকোষ

আপসনামা	একটি আইনি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মামলা উঠিয়ে নিতে আদালতে আবেদন করা যায়
বদমেজাজী	অল্পতেই যে রেগে যায়
চৌকিদার	স্থানীয় নিরাপত্তা প্রহরী
দারোগা	পুলিশ কর্মকর্তা (পরিদর্শক/উপ-পরিদর্শক/সহকারী উপ-পরিদর্শক)
দেওয়ানি	সিভিল
ধর্মভাই	যে সামাজিক সম্পর্কে একজন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে বিবেচনা করা হয়
ধর্মছেলে	যে সামাজিক সম্পর্কে একজন ব্যক্তিকে ছেলে হিসেবে বিবেচনা করা হয়
গ্রামের দশ	গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা
গ্রামীণ সালিশ	গ্রামবাসী কর্তৃক আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা
হাফেজ	যে ব্যক্তি কোরআন শরিফ মুখস্থ করেন
জুদা খাওয়া	শ্বশুর-শাশুড়ির সংসার থেকে আলাদাভাবে বসবাস
কাজী	বিয়ের নিবন্ধক
খুলা তালাক	মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ে হওয়ার পর একজন নারীর সুবিধামতো ও সম্মতিতে স্বামীকে তালাক দিতে পারার প্রক্রিয়া
মোহর	একটি আরবি শব্দ, যার মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা বোঝানো হয়, যা ইসলামি পদ্ধতিতে বিয়ের সময় স্ত্রীকে স্বামী অর্থ বা সম্পত্তি হিসেবে পরিশোধ করেন
মামলাবাজ	মামলা করা যার শখ
মাতব্বর	স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি
মুন্সি	থানার কেরানি
কাবিননামা	বিয়ের দলিল
পান-সুপারি	প্রথমবার শিশুসন্তানের চুল কাটা উদ্‌যাপন করতে পালিত উৎসব
আরজে সহায়ক	রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক, আরডিআরএসের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, যারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে সাহায্য করেন
সালিশ	মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে বৈঠক
সালিশকার	মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তি বৈঠকের উদ্যোগ বা আয়োজন করেন

দুইজন প্যানেল আইনজীবী এবং ব্লাস্টের একজন প্যারালিগ্যাল পটুয়াখালীর মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতের দিকে যাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট | আইনি ভাষ্য

পারিবারিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা বিষয়ে আইনি জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মন্তব্য [১]

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

সারা হোসেন, আবদুল্লাহ তিতির, ইসরাত জাহান সিদ্দিকি এবং সাইদুল ইসলাম অন্তর [২]

১. যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮

২০১৮ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় বিয়ের সময়, বিয়ের আগে অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যৌতুক দেওয়া-নেওয়া নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ (যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৩ ও ৪)। যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেল এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে (ধারা ৩ ও ৪)। বর, কনে, তাদের পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক অথবা বিয়ের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এসব ধারা প্রযোজ্য। এই আইন ২০১৮ সালের ১ অক্টোবর কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একই নামের চল্লিশ বছরের পুরোনো আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে (যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০)। আগের আইনে যেসব মামলা বিচার বা তদন্তের জন্য ঝুলে আছে, নতুন আইনে সেগুলো অব্যাহত রাখার বিধান রয়েছে [ধারা ১০ (২), যৌতুক নিরোধ আইন]।

---

[১] ব্লাস্টের সহকর্মীদের মন্তব্য ও অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার- আয়েশা আকতার, মো. বরকত আলী, শারমিন আকতার, সিফাত-ই-নূর খানম, শিপ্রা গোস্বামী এবং তাপসী রাবেয়া।

[২] বিআইজিডি/ব্লাস্ট/ব্র্যাক/আরডিআরএসের এই গবেষণার বারোটি কেস স্টাডি এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতায় বাংলাদেশের বিবাহিত নারীদের যেসব জিজ্ঞাসা রয়েছে, শুধু সেগুলোর প্রেক্ষিতেই এসব মন্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। হিন্দু বা খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইন, প্রথাগত আইন বা বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় বিবাহিত নারীদের পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকারে সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি।

এই আইনে 'যৌতুক' বলতে বিয়েতে টাকা বা অন্য কোনো সম্পদ দাবি করা বা নেওয়া অথবা কোনো পক্ষ দিতে রাজি হওয়াকে বোঝায় [ধারা ২(খ)]। মুসলিম আইনের আওতায় বিয়ের চুক্তিতে এককালীন টাকা হিসেবে যে দেনমোহর দেওয়া হয়, তা যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত নয় [মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়া) প্রয়োগ বিধি ১৯৩৭, ধারা ১ দেখুন]। বিয়েতে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের দেওয়া উপহারও যৌতুকের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় [ধারা ২(খ)]।

যৌতুকসংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আবেদন বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি প্রয়োগ করা হয়। এই আইনের আওতায় যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা বিচারযোগ্য, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ আদালতের পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে [যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪ (১)(চ)]। এছাড়া এটি জামিন-অযোগ্য (যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৭); অর্থাৎ একবার গ্রেপ্তার করা হলে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি জামিনের অধিকার হারান। তবে আদালতের আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পেতে পারেন; কিন্তু তা-ও খারিজ করার ভিত্তি থাকলে খারিজ হয়ে যেতে পারে [ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪(১)(চ)]। সবশেষে এটি আপসযোগ্য (যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৭) অর্থাৎ সমঝোতা হলে যে পক্ষ মামলা করেছেন, সে পক্ষ তা উঠিয়ে নিতে পারেন।

যদি এই আইনে একজন আরেকজনকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দেন, তাহলে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীর পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল কিংবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে (যৌতুক নিরোধ আইনের ধারা ৬)। কিন্তু এর আগে আদালত নিশ্চিত হয়ে নেবেন, যারা মামলা করেছেন, তারা প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মামলা করেছেন কি-না।

২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০

সংবিধানে বর্ণিত 'নারী ও শিশুর সমান অধিকার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সালে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন করা হয়। এছাড়া নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা প্রদানের জন্য নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ এবং শিশু অধিকারবিষয়ক (সিআরসি) জাতিসংঘের কনভেনশন (সিডও) প্রতিপালনে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার লক্ষ্যে (প্রস্তাবনা) এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

এই আইনে পারিবারিক সহিংসতা বলতে বোঝায় "কোনো পরিবারের নারী বা শিশুর বিরুদ্ধে সেই পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন কিংবা অর্থনৈতিক শোষণ, যার সঙ্গে ভুক্তভোগীর পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে" (ধারা ৩)।

শুধু নারী ও শিশু (আঠারো বছর বয়সের নিচে) (শিশুবিষয়ক আইন, ধারা ৪, ২০১৩) এই আইনের আওতায় পারিবারিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা চাইতে পারেন। এই আইনে 'ভুক্তভোগী' বলতে বোঝায় শিশু বা নারী, যিনি পরিবারের অন্য কোনো সদস্য দ্বারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন বা শিকার হয়েছেন, যার সঙ্গে ভুক্তভোগীর পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই আইনের বড় একটি সীমাবদ্ধতা হলো, যে ব্যক্তি বিদ্যমান পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নেই (যেমন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী), এই আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে পারেন না।

এই আইনের আওতায় একজন ভুক্তভোগীকে সরাসরি সুরক্ষা চাইতে হয় না। অন্যরাও (যেমন– একজন পুলিশ কর্মকর্তা, নির্বাহী কর্মকর্তা, সেবাপ্রদানকারী অথবা অন্য যে কোনো ব্যক্তি) ভুক্তভোগীর হয়ে সুরক্ষা চাইতে পারেন। সবচেয়ে কাছের বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করতে হবে (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ধারা ১১)। ভুক্তভোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী আদালত ভিন্ন কোনো আদেশ দিতে পারেন, যার মধ্যে থাকতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ (ধারা ১৩), সুরক্ষা আদেশ (ধারা ১৪), বসবাসের আদেশ (ধারা ১৫), ক্ষতিপূরণ আদেশ (ধারা ১৬) বা তত্ত্বাবধানের আদেশ (১৭)।

পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে যে কোনো তথ্য গ্রহণের পর বা অভিযোগের পর একজন পুলিশ কর্মকর্তার সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ধারা ৪) হলো আইনি প্রতিকার ও চিকিৎসাসেবা, আইনি সাহায্য পাওয়ার সুযোগ এবং নির্বাহী কর্মকর্তার সেবা পাওয়ার ব্যাপারে ভুক্তভোগীকে জানানো।

একজন নির্বাহী কর্মকর্তার সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব হলো ভুক্তভোগী এবং আদালতকে এই আইনের আওতায় দায়ের করা মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সহায়তা করা (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ধারা ৫)। আদালতে তাঁর দায়িত্ব হলো কার্যক্রম সম্পাদনে আদালতকে সহায়তা করা, পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল এবং এসব প্রতিবেদনের কপি থানায় পাঠানো। ভুক্তভোগীর প্রতি তাঁর দায়িত্ব হলো ভুক্তভোগীর পক্ষে সুরক্ষা আদেশের জন্য আবেদন করা এবং তাকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করা।

সেবাপ্রদানকারী, যারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে এই ধরনের তথ্য পান, তাদেরও ভুক্তভোগীর সম্মতি নিয়ে এসব ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল এবং সেই প্রতিবেদন আদালত ও নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পাঠানোর সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব রয়েছে (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন [ধারা ৭ (২) (ক)]। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী ভুক্তভোগীকে চিকিৎসা সহায়তা বা আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে সুপারিশ করার ব্যাপারে সেবাপ্রদানকারীদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইন অনুযায়ী সেবাপ্রদানকারী বলতে বোঝায় সাময়িক বলবৎ হওয়া যেকোনো আইনের আওতায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো সংগঠন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য থাকে যেকোনো বৈধ পদ্ধতিতে মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদান, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অধিকার ও স্বার্থের

সুরক্ষা, যার মধ্যে রয়েছে আইনি, চিকিৎসা, আর্থিক বা অন্যান্য সহায়তা প্রদান [পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ধারা ৭(১)]।

আদালত তার বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে ভুক্তভোগী এবং তার সন্তানকে জীবন-জীবিকার মানদণ্ড অনুযায়ী 'পর্যাপ্ত ভরণপোষণ' প্রদান করতে স্বামীকে আদেশ দিতে পারেন [ধারা ১৬ (৫)], অথবা এককালীন বা মাসিক অর্থ পরিশোধের আদেশ দিতে পারেন [ধারা ১৬ (৬)]।

এই আইনের আওতায় আদালতের যে কোনো আদেশ লঙ্ঘন করা একটি অপরাধ। এসব অপরাধ বিচারযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপসযোগ্য (ধারা ২৯)। এর মানে হলো, এই ধরনের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারবে (বিচারযোগ্য) এবং সেই ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারও থাকবে (জামিনযোগ্য)। ঘটনায় জড়িত পক্ষগুলো (ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি) আদালতের বাইরেও সমঝোতা করতে রাজি হতে পারবেন। তারা আদালতকে এ বিষয়ে অবহিত করলে এই মামলা আর চলবে না (আপসযোগ্য)।

যদি কেউ সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহলে তাকে প্রথমবার অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড কিংবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হতে পারে (ধারা ৩০)। যদি একই অপরাধ আবারও করেন, তাহলে সাজা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে কিংবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।

৩. বাস্তবে পারিবারিক সহিংসতায় আইনি সুরক্ষা

যেসব আইনজীবী পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তারা বেশকিছু কারণে সাধারণত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের না করে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যদি যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করা বা গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে। অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কারাদণ্ডও হবে। যৌতুক নিরোধ আইনের মামলাগুলো জামিন-অযোগ্য। সাধারণত জামিন-অযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে বিবাদী হাজতে থাকা অবস্থায় আদালত প্রথমবার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। তবে জামিন-অযোগ্য মামলার ক্ষেত্রেও আদালত তার বিচারিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে জামিন প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে যদি আদালত মনে করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যেতে পারেন, প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন কিংবা ভুক্তভোগী বা সাক্ষীকে হুমকি দিতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ইতোমধ্যে কারাগারে না থাকেন কিন্তু গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে আশঙ্কা থাকে, অর্থাৎ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইতোমধ্যে জারি হয়ে গেছে, তাহলে তিনি উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিতে পারেন।

কিছু কিছু আইনজীবী পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের বদলে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মামলা দায়ের করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি যুক্তি তুলে ধরেন। তারা বলেন, এসব সহিংসতার শিকার ব্যক্তি তাদের অনুরোধ করেন—অভিযুক্তকে যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হলো, গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের হুমকি কাজে লাগিয়ে ভরণপোষণের অমীমাংসিত দাবির বিষয়ে দ্রুত ফলাফল আসে বা সমঝোতা করা যায়। আরেকটি কারণ হলো, যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় গ্রেপ্তারের সুযোগ থাকায় আইনজীবীরা সহজেই বিবাদীকে আদালতে হাজির করতে পারেন। অন্যদিকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় বিবাদীকে আদালতে হাজির করা কঠিন, কারণ এই আইনে আদালতের প্রাথমিক আদেশের ধরন থাকে দেওয়ানি। এর ফলে শুধু সমন জারি করা হয়, কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় না।

বহু ঘটনায় দেখা যায়, পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীরা আইনজীবীদের অনুরোধ করেন—যেন ২০০০ সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান ব্যবহার করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়া। এর কারণ হতে পারে তারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সঙ্গে বেশি পরিচিত, যৌতুক নিরোধ আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা কম, অথবা তারা সুরক্ষামূলক আদেশের চেয়ে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা দেখতে চান।

আইনজীবীদের পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের না করার পেছনে একটি বড় কারণ হলো, তাদের অনেকেই এই আইন এবং এই আইনে যেসব প্রতিকার রয়েছে, তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত নন। যে কোনো মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তাদের প্রয়োজন বুঝে প্রাসঙ্গিক আইনে মামলা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের জন্য ব্লাস্টের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। তবে এই নির্দেশিকায় সুনির্দিষ্টভাবে যৌতুক নিরোধ আইনের অপব্যবহার না করার ব্যাপারে কিছু বলা নেই। নির্দেশিকায় বলা আছে, ব্লাস্টের সকল আইনজীবীর (স্টাফ, প্যানেল) উচিত তাদের মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করা যে, তারা আসলে কীসের বিরুদ্ধে প্রতিকার পেতে চান। এরপর সে অনুযায়ী মক্কেলদের পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সেসব প্রতিকার লাভে প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করা উচিত। নির্দেশিকায় সরাসরি স্পষ্ট করা হয়নি যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে যে আইন প্রাসঙ্গিক নয়, প্রতিকার পেতে সেই আইন ব্যবহার করা যাবে না (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন/যৌতুক নিরোধ আইনের বিষয়)। এর অর্থ দাঁড়ায়, আইনজীবীরা যখন পরামর্শ দিচ্ছেন বা মামলা দায়ের করছেন, তখন এমনটা ঘটবে না।

৪. আফরোজার ঘটনা

ভরণপোষণের অর্থ আদায়: ভরণপোষণের মামলায় যদি বিবাদী (স্বামী বা সাবেক স্বামী) হাজির না হন, তাহলে আদালত একতরফা শুনানি করবেন, অর্থাৎ বিবাদীর অনুপস্থিতিতেই। আদালত

যখন ভরণপোষণের জন্য করা স্ত্রীর আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ করে রায় দেন, তখন আদালত স্বামীকে হাজির হওয়ার জন্য সমনও জারি করেন। সমন জারি করার পরও যদি স্বামী হাজির না হন, তাহলে স্ত্রী বা সাবেক স্ত্রীকে ভরণপোষণের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য একই আদালতে আরেকটি আলাদা মামলা দায়ের করতে হবে। স্বামী যদি আদালতের নির্দেশিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে স্ত্রী অথবা সাবেক স্ত্রী আদালতের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার অনুরোধ করতে পারেন [ধারা ৫১(গ), সিপিসি]। সাধারণত আইনজীবীরা জানান, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পরও অনেক সময় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্ত স্বামী একের পর এক বাসস্থান পাল্টাতে থাকেন। এছাড়াও আইনজীবীরা জানান, বাস্তবে দেখা যায় অভিযুক্ত স্বামী নিজ এলাকায় থাকার কথা জানার পরও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশ প্রতিপালনে পুলিশের অনীহা থাকে।

পারিবারিক সহিংসতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ: যদি কোনো ব্যক্তি দেশের বাইরে থাকেন, তাহলে তাকে বাংলাদেশের আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা খুবই কঠিন। এই গবেষণার বেশিরভাগই দেওয়ানি মামলা, ভরণপোষণ না দেওয়ার অপরাধ। তাই অন্য দেশের সঙ্গে বন্দি বিনিময়ের আওতায় এসব অপরাধ পড়ে না (শিডিউল, বন্দি বিনিময় আইন, ১৯৭৪)। বন্দি বিনিময়যোগ্য অপরাধ যেমন "বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর শারীরিক আঘাতের" মতো ঘটনার ক্ষেত্রেও অনেক দেশের সঙ্গে বন্দি বিনিময় ব্যবস্থা না-ও থাকতে পারে।

আইনজীবীর মাধ্যমে হাজির হওয়া: পারিবারিক মামলাসহ দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে আইনজীবী তার মক্কেলের পক্ষে আদালতে হাজির হতে পারেন। অনেক সময় ব্যক্তিগত আইনজীবী বা আইনি সহায়তা সংগঠনের প্রতিনিধিরা এ ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে থানায় দায়ের করা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী বেশিরভাগ সময় রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত সরকারি কৌঁসুলির মাধ্যমে আদালতে হাজির হন। একইভাবে, সরাসরি আদালতে দায়ের করা অভিযোগ বা মামলার ক্ষেত্রেও একজন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োজিত হন, যদিও অনেক সময় ভুক্তভোগী নিজেও ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করেন। ব্যক্তিগত আইনজীবী সরকারি কৌঁসুলিকে সহায়তা করার অনুমতি পেতে পারেন এবং আদালতে হাজির হতে পারেন (অস্থায়ী শুনানি পর্যন্ত), যদি আদালত তাদের সহায়তার জন্য লিখিত আবেদন মঞ্জুর করেন (সিআরপিসি, ধারা ৪৯৩)। এর আগেও যে কোনো সময় আদালত চাইলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার মাধ্যমে অভিযুক্তকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

৫. রূপার ঘটনা

আপসনামার কপি পাওয়া: যে কোনো মামলায় যদি উভয় পক্ষ আদালতের বাইরে নিজেরা আপসরফা করেন, তাহলে উভয় পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীদের কাছে আপসরফার অনুলিপি থাকতে হবে। তবে স্ত্রীর কাছে আপসনামার অনুলিপি না রেখেই যদি আদালতে মূল দলিল জমা

দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা আদালতে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে আইনজীবীর মাধ্যমে সেই স্ত্রী একটি সত্যায়িত অনুলিপি পেতে পারেন (ফৌজদারি বিধি ও আদেশ ২০০৯, ধারা ২৪৩)। আবার, আপসনামা যদি স্বামীর আইনজীবীর হেফাজতে থেকে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে স্ত্রী একটি অনুলিপি চাইতে পারেন। আইনি সেবাপ্রদানকারী সংস্থা ব্লাস্ট সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতার আপসনামার হাতে লেখা অথবা কম্পিউটারে টাইপ করা (পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে) অনুলিপি উভয় পক্ষকেই দিয়ে থাকে। তবে কোনো ফটোকপি দেওয়া হয় না। কারণ এতে পরবর্তীকালে বিবদমান পক্ষগুলোর স্বাক্ষর জাল করার ঝুঁকি থাকে।

আপসনামা উঠিয়ে নেওয়ার সুযোগ: দুই পক্ষই আপসনামায় স্বাক্ষর করা এবং তা আদালতে জমা দেওয়ার পরও যে কোনো পক্ষ তা উঠিয়ে নিতে পারেন। তবে আদালতে যথাযথ কারণ দেখাতে হয়। যে পক্ষই আপসনামা উঠিয়ে নিতে চান, তাকে আদালতে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে এবং এর কারণ আদালতকে অবহিত করতে হবে (যেমন: প্রতারণা বা জোরপূর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হতে পারে)। এরপর আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করলে আপসনামা উঠিয়ে নিতে পারবেন।

তালাকের নোটিশ হিসেবে হলফনামা: শুধু হলফনামা করলেই, অর্থাৎ সংসার করতে চান না মর্মে শপথ হিসেবে সত্যতা স্বীকার করে লিখিত কোনো বিবৃতি এবং আদালতে বা নোটারি পাবলিকে দেওয়া বিবৃতি কিংবা এ ধরনের যে কোনো ঘোষণা দিলেই তালাক হয়ে যায় না। মুসলিম আইনে বিয়ের ক্ষেত্রে তালাকের প্রক্রিয়া ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ ও ৮ নম্বর ধারায় বর্ণিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে কোনো পক্ষ চেয়ারম্যানের (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, অথবা পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন) কাছে লিখিত নোটিশ পাঠিয়ে তালাকের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন, কিংবা বিয়ে ভেঙে দিতে আবেদন করতে পারেন। ২০০৯ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধির (বিয়ে ও তালাকের নিবন্ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট ধরনের উল্লেখ রয়েছে এই বিধিতে) তালিকায় এই নোটিশের কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। তালাকের নোটিশ হিসেবে হলফনামা চালানো যেতে পারে, কিন্তু তা চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাতে হবে। এ ধরনের হলফনামা সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে, অর্থাৎ তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে।

৬. আয়েশার ঘটনা

খুলা তালাক: খুলা তালাক এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মুসলিম আইনের আওতায় বিবাহিত একজন নারী চাইলে নিজ ইচ্ছায় এবং নিজ সম্মতিতে তার স্বামীকে তালাক দিতে পারেন [মোল্লা, প্রিনসিপলস অব মোহামেডান ল (লেক্সিসনেক্সিস ২০১৩) ৪০২]। কাবিননামার ১৮ নম্বর ধারা কিংবা অন্য কোনো দলিলে লিখিতভাবে স্বামী কর্তৃক তালাক পাওয়ার অধিকার যেসব বিবাহে নারীকে দেওয়া হয় না, সে ক্ষেত্রে নারীরা খুলা তালাকের আশ্রয় নিতে পারেন।

খুলা তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রী বিয়ের সম্পর্ক থেকে বের হয়ে যেতে স্বামীকে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব দেন বা দিতে রাজি হন। বাস্তবে দেখা যায়, একজন নারী তালাক পেতে এবং বিয়ের বন্ধন থেকে বের হতে দেনমোহরের টাকা মওকুফ করে দেন বা কমিয়ে দেন।

বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণ: এ ধরনের ধর্ষণ বলতে বোঝায় বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ দুজন ব্যক্তি, যেখানে এক পক্ষের সম্মতি ছাড়া বা জোরপূর্বক অন্যপক্ষ যৌনমিলন করে। এ ধরনের ধর্ষণ বাংলাদেশের আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। তবে ব্যতিক্রম ঘটে যদি স্ত্রীর বয়স তেরো বছরের নিচে হয় (১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ৩৭৫ নম্বর ধারা দেখুন)। যেহেতু আয়েশার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর, তাই 'ব্যতিক্রমী' পদ্ধতিতে সুরক্ষার ধারা তার জন্য প্রযোজ্য নয়, যদিও প্রতিনিয়ত তার স্বামী তার সম্মতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যৌনমিলনে বাধ্য করেছিলেন। অন্যদিকে, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ষোলো বছর বয়সের নিচে কোনো নারীর সঙ্গে যৌনমিলন করেন, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার পরও তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর মানে হলো, এই আইনের আওতায় আয়েশা 'বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণের' যে অভিযোগ করেছেন, সে বিষয়ে তিনি সুরক্ষা পেতে পারেন।

৭. রিনার ঘটনা

দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি: মুসলিম আইনে একজন পুরুষ যদি বিদ্যমান কোনো বিয়ের সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থাপিত সালিশি পরিষদকে আগে থেকে নোটিশ না দিয়ে এবং পরিষদের অনুমতি ছাড়া অন্য নারীকে বিয়ে করতে পারবেন না (১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৬ নম্বর ধারা)। দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাওয়া পুরুষকে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে এবং নির্ধারিত ফি দিতে হবে। এই আবেদনে দ্বিতীয় বিয়ের কারণ এবং বিদ্যমান স্ত্রীর সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি-না, তা উল্লেখ করতে হবে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৬ (২) নম্বর ধারা]। চেয়ারম্যান স্বামী ও তার বিদ্যমান স্ত্রীকে আলাদা প্রতিনিধি মনোনীত করতে বলবেন। এরপর সালিশ পরিষদ গঠিত হবে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৬ (৩) নম্বর ধারা]। সালিশি পরিষদ যদি মনে করে যে দ্বিতীয় বিয়ে প্রয়োজনীয় এবং ন্যায্য, তাহলে অনুমতি প্রদান করবে এবং শর্তারোপ করবে। সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া যদি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তাহলে বিদ্যমান স্ত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৬ (৫)(ক) নম্বর ধারা]। এছাড়াও স্বামীর সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড কিংবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৬ (৫)(খ) নম্বর ধারা]।

যেসব আইনজীবীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা জানান, অনেক এলাকায় এসব বিষয়ে সালিশি পরিষদ স্থাপন করা হয় না এবং এসব প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয় না।

তালাকের নোটিশ: মুসলিম আইনে স্বামী বা স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে 'তালাক' উচ্চারণ করে চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ পাঠাতে হবে এবং অপর পক্ষকে সেই নোটিশের অনুলিপি দিতে হবে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৭ ও ৮ নম্বর ধারা]। এরপর চেয়ারম্যানের কর্তব্য হলো দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্যে সালিশি পরিষদ স্থাপন করা। পরিষদের দায়িত্ব হলো এটি শেষ করতে 'সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ' করা, অন্তত মধ্যস্থতার জন্য দুই পক্ষকেই নোটিশ পাঠানো। তালাক যদি বাতিল করা না হয়, তাহলে নোটিশ পাওয়ার নব্বই দিন পর আপনাআপনি তালাক কার্যকর হয়ে যাবে, কিংবা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়ে থাকেন, তাহলে তার গর্ভাবস্থা শেষ হওয়ার পর কার্যকর হবে। অর্থাৎ দুটির মধ্যে যেটি পরে শেষ হবে, সেটিই বিবেচনায় নিতে হবে [১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ৭ নম্বর ধারা]। তালাক চূড়ান্ত হয়ে গেলে, কাজীর কাছে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে [মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪, ৬ নম্বর ধারা]। নিবন্ধন না করলেও তালাক অবৈধ হয়ে যায় না। সাধারণত দেখা যায় নব্বই দিন সময় পার হওয়ার আগেই নোটিশ দেওয়ার পরপর কাজী তালাক নিবন্ধন করে ফেলেন। এর ফলে একজন নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

যে কোনো ব্যক্তি তালাক পাওয়ার পর মৌখিকভাবে কাজীর কাছে নিবন্ধনের জন্য বলতে পারেন [মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪, ৬(২) নম্বর ধারা]। যদি কোনো নারী খুলা তালাকের মাধ্যমে তালাক দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি খুলা তালাকের অধিকারসংক্রান্ত দলিল, নিকাহনামা, কিংবা অন্য কোনো দলিল প্রদান করে তা প্রমাণ করবেন [মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪, ৬ নম্বর ধারা]। নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর, কাজী দুই পক্ষকেই নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে কোনো ফি নেওয়া যাবে না [মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪, ৯ নম্বর ধারা]।

মামলার শুনানির সময় তালাক: যদি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় কোনো মামলা চলমান থাকা অবস্থায় কোনো দম্পতি তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী তার সুরক্ষা অধিকার হারাতে পারেন। তালাকের পর তিন মাস স্ত্রীকে ভরণপোষণের খরচ প্রদানে স্বামীর কর্তব্য সীমিত থাকবে। অন্যদিকে, যদি দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক না হওয়া বা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত ভরণপোষণের খরচ প্রদান করতে থাকবেন। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় মামলা দায়ের করার এটি একটি চ্যালেঞ্জ। যদি কোনো নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে থাকেন, তাহলে তিনি এই আইনের আওতায় শুধু আইনি সুরক্ষা চাইতে পারেন। কিন্তু যদি পারিবারিক সহিংসতার মামলা চলমান থাকা অবস্থায় তালাক হয়ে যায়, তাহলে এই আইনের আওতায় তাকে সুরক্ষা দেওয়া হয় না।

নারীর বসবাসের অধিকার: পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় নারীকে তার বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত সংসারে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে পারিবারিক সম্পর্কে বিদ্যমান থাকলেই কেবল এই অধিকার প্রযোজ্য। কিন্তু পরিবারে অধিকার, পারিবারিক

সম্পর্কের অস্তিত্ব এবং তার সমাপ্তি (হতে পারে তালাকের মাধ্যমে) নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত আইন দ্বারা, যা সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন হয়। সেজন্য একজন নারীর বসবাসের অধিকার নির্ভর করে তিনি মুসলিম, হিন্দু, নাকি খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইন কিংবা বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় বিয়ে করেছেন তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত কোনো আইনেই পারিবারিক বা বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ির অধিকার স্বীকৃত নয়।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে ভরণপোষণ ও তালাকসংক্রান্ত প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। বহু দেশে শ্বশুরবাড়িতে বাড়ি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নারীর অবদানের ওপর নির্ভর করে তাকে অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আইনে তা সম্পূর্ণ স্বীকৃত নয়। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রথম কোনো আইন, যেখানে বসবাসের আদেশ প্রচলন করে এই ধরনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ধারা ১৫)। এই আইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে একজন বিবাহিত নারীর বসবাসের অধিকার কার্যকরভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই সুরক্ষা পদ্ধতিতে পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারীর অধিকার বলবৎ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সাধারণত নারীদের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বা নিজের নামে সম্পত্তির মালিকানা থাকে না। এর ফলে পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সিদ্ধান্তের জন্য একজন নারীকে নির্ভর করতে হয় একজন পুরুষের ওপর, বিশেষ করে স্বামীর ওপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে বসবাসের অধিকার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু নারী আর্থিকভাবে খুবই বিপন্ন। তাই বিয়ে ভেঙে গেলে বা পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় তারা আর্থিক সহায়তার জন্য পরিবারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সহিংসতার শিকার নারীর জন্য জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে জায়গা সংকট রয়েছে।

সাধারণত দেখা যায়, বসবাসের আদেশ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ থাকে, বিশেষ করে যখন একজন নারী তার শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করেন। যদি সেই নারী শ্বশুরবাড়ির বাইরে নিজের স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাড়িতে থাকেন (সন্তান যদি থাকে তাহলে সন্তানসহ), তাহলে বসবাসের আদেশ বাস্তবায়নের সুযোগ বেশি থাকে।

৮. ফাতেমার ঘটনা

স্বামীর জাতীয় পরিচয়পত্রের বদলে জন্মসনদ: যদি কোনো স্বামী ভরণপোষণের মামলায় নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র দিতে না চান, তাহলে স্ত্রী বা সাবেক স্ত্রী যিনি সন্তানের ভরণপোষণ পেতে চাইছেন, তিনি সন্তানের জন্মের পর হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত সনদ দাখিল করতে পারবেন। নারীরা সাধারণত এসব নথিপত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। তারা এসব দায়িত্ব স্বামীর ওপর ছেড়ে দেন। তবে অনেক সময় হতে পারে যে স্ত্রী হাসপাতাল থেকে সন্তানের জন্মসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন না কিংবা হাসপাতাল থেকে এমন কোনো নথিপত্র

দেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে সেই নারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (২০০৪ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ধারা ৪) থেকে সন্তানের জন্মসনদ সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করতে পারবেন (১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ধারা ১১২)। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্ব হাসপাতালের নয়, কিন্তু আইনের ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী তারা এ-সংক্রান্ত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষকে দিতে পারেন। এরপর কর্তৃপক্ষ নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বাল্যবিবাহ, কাজীর দায়: বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে যে কাজী বিয়ের নিবন্ধন করেন, তিনি সর্বনিম্ন ছয় মাস এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড পেতে পারেন কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড পেতে পারেন অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হতে পারেন। যদি তিনি জরিমানা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হতে পারে এবং তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১১ নম্বর ধারা)। সাধারণত দেখা যায়, কাজী এই দায় এড়াতে বলে থাকেন যে, বিয়ের সময় মেয়ের বাবা-মায়ের দেওয়া কাগজপত্রে মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখানো হয়েছে। বিয়ের আইনসম্মত বয়স হয়েছে কি-না, তা যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মসনদ, পাসপোর্ট অথবা মাধ্যমিক, জুনিয়র বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সনদ (বা সমমানের শিক্ষা সনদ) স্বীকৃত (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১২ নম্বর ধারা)। বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজী তখনই বিয়ের নিবন্ধন করবেন, যদি দেখা যায় যে প্রদত্ত আইনি কাগজপত্রে বর-কনের আইনসম্মত বিয়ের বয়সের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যদি কাবিননামায় বর্ণিত থাকে যে বর-কনে 'প্রাপ্তবয়স্ক' কিন্তু উপরে উল্লিখিত কাগজপত্রে তা প্রমাণিত নয়, তাহলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কাজী দায়ী থাকবেন। এখানে 'প্রাপ্তবয়স্ক' বলতে বোঝানো হচ্ছে কনের বয়স আঠারো বা তার বেশি আর বরের বয়স একুশ বা তার বেশি। তবে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী, বিয়ের বর-কনের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ব্যাপারে নিকাহনামায় স্পষ্ট করে বলা নেই। সাধারণত পিতা-মাতা তাদের সন্তানের বাল্যবিবাহ দিয়ে থাকেন দরিদ্রতার কারণে এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে। করোনা অতিমারিকালে ক্রমবর্ধমান অনিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে ব্যাপকহারে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এক বছরের বেশি সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মেয়েরা ঘরে থাকতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা ঘটেছে।

৯. মীনার ঘটনা

সন্তানের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব নিয়ে বাংলাদেশের আইনে যা আছে:

বাংলাদেশে সন্তানের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্বের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন রয়েছে, এর উত্তর পাওয়া যায় মূলত ১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে। এই আইনে অনেক বিষয়ের মধ্যে অভিভাবক নিয়োগ ও ঘোষণা, তাদের অধিকার ও কর্তব্য এবং তা প্রতিপালন করতে না পারলে জরিমানার বিষয়ে বলা আছে। সন্তানের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্বের জন্য পারিবারিক আদালতে আবেদন করতে হয় (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, ধারা ৫)। বৈধ

প্রতিপালনের অধিকার থাকা পিতা-মাতার যে কোনো একজনের কাছ থেকে সন্তানকে অপহরণ/ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এখতিয়ার হলো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের (সিআরপিসি, ধারা ১০০)। পাশাপাশি উচ্চ আদালত বিভাগের সিআরপিসি-এর ৪৯১ ধারা, কিংবা বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ নম্বর ধারা। ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার রয়েছে (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ধারা ৫)। মুসলিম আইনের আওতায়, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত পিতা হলেন সন্তানের বৈধ ও স্বাভাবিক অভিভাবক। কিন্তু অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে সন্তানের অভিভাবক নির্ধারণে ব্যক্তিগত আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সন্তানের বয়স, লিঙ্গ এবং ধর্মের মতো বিষয়ের পাশাপাশি অভিভাবকের চরিত্র ও সক্ষমতাও বিবেচনায় নেওয়া হয় (অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ধারা ১৭)।

সুপ্রিম কোর্টের অনেক আদেশে বলা হয়েছে, প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্তানের কল্যাণই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। যেমন- আবু বকর সিদ্দিকি বনাম এসএমএ বকর[৩] [(১৯৮৬) ৩৮ ডিএলআর (এডি) ১০৬] মামলায় আদালত আদেশ দেন যে সবসময় সন্তানের বয়স-লিঙ্গ বিধানের বদলে প্রতিপালনের অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্তানের কল্যাণ বিবেচনা করতে হবে (যেখানে বলা হয়েছিল সাত বছর বয়সের বেশি বয়সী ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতার)। শ্যারন জলিল মামলায় [(১৯৯৮) ৫০ ডিএলআর (এডি) ৫৫], উচ্চ আদালত আদেশ দেন সন্তানের মা সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব পাবেন। এই মামলায় সন্তানের মা ছিলেন একজন অ-মুসলিম। তবে আদালত আদেশে আরও বলেন- যদি কোনো মা পুনরায় বিয়ে করেন, তাহলে সন্তানের প্রতিপালনের অগ্রাধিকার হারাবেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে অভিভাবকত্বের জন্য তাকে একেবারে অযোগ্য মনে করা হবে (রহমতুল্লাহ্ (মো.) এবং অন্যান্য বনাম সাবানা ইসলাম ও অন্যান্য [(২০০২) ৫৪ ডিএলআর ৫১৯]।

যদি স্বামী বা সাবেক স্বামী সন্তানকে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সম্মতি না নিয়ে ছিনিয়ে নেন, তাহলে একজন মা কীভাবে সন্তান প্রতিপালনের অধিকার ফিরে পেতে পারেন?

যদি কোনো নারীর স্বামী বা সাবেক স্বামী তার সন্তানকে সম্মতি ছাড়া নিয়ে যান, তাহলে তিনি সন্তানকে ফিরে পেতে সন্তানের বাবার প্রতি আদেশ জারি করাতে পারিবারিক আদালতে আবেদন করতে পারবেন। যদি সন্তানের পিতা আদেশ না মানেন, তাহলে তাকে জরিমানা ও সিভিল কারাগারে আটক রাখা হতে পারে (অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ধারা ২৫ ও ৪৫)। অন্য আরেকটি উপায় হলো, সেই নারী সন্তান উদ্ধারে তল্লাশি পরোয়ানা জারি করাতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করতে পারেন (সিআরপিসি, ধারা ১০০)। সবশেষে, তিনি উচ্চ আদালত বিভাগে আবেদন দায়ের করতে পারেন (সিআরপিসি, ধারা ৪৯১, অথবা বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ নম্বর ধারা)।

[৩] [১৯৮৬] ৩৮ ডিএলআর (এডি) ১০৬, প্রধান বিচারপতি এফ. কে. এম. এ. মুনিম, বিচারপতি বিএইচ চৌধুরী এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। ১০।

সাধারণত দেখা যায়, নারীরা এসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন না অথবা আইনি পরামর্শ বা সহায়তা পাওয়ার সুযোগ তাদের নেই। এর বদলে তারা সন্তান প্রতিপালনের অধিকার ফিরে পেতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তা চান (যেমন– ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান)। এসব চেষ্টা মাঝে মাঝে সফল হয়। এর ফলে আইনি প্রক্রিয়াও এড়ানো যায়।

সন্তানের ভরণপোষণের দায় কার?

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে বলা আছে, সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার অভিভাবকের (অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ধারা ২৪)। মুসলিম আইনে পিতাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। তাই সন্তানের ভরণপোষণের দায় পিতার ওপরই বর্তায়, এমনকি সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়ের কাছে থাকলেও। ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণ চালিয়ে যেতে হবে আর মেয়েসন্তানের ক্ষেত্রে বিয়ের আগপর্যন্ত (স্যার দিনশো ফারদুনজি মোল্লা, প্রিনসিপলস অব মোহামেডান ল, [২০তম সংস্করণ, (লেক্সিসনেক্সিস), পৃষ্ঠা ৪৫৪]। পিতা যখন আর অভিভাবক থাকেন না, তখন ভরণপোষণের দায় তার নেই।

আইন কি বৈষম্যমূলক কিংবা আইনে কি এমন কোনো ফাঁকফোকর আছে যা সন্তান প্রতিপালনে অধিকার পাওয়ার বিষয়টি মায়ের জন্য কঠিন করে তোলে?

১৮৯০ সালের অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন হলো সন্তানের প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নিয়মকানুনের মূল আইন। পিতা-মাতার জন্য প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ব্যক্তিগত আইনের সঙ্গে মিলিয়ে এই আইন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যদি পিতা-মাতা মুসলিম হয়, তাহলে অভিভাবকত্ব বিষয়ে সকল বিষয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে [মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়া) আবেদন আইন ১৯৩৭, ধারা ২]। এই আইন অনুযায়ী, মুসলিম পিতা জীবিত থাকলে, তিনি-ই সন্তানের একমাত্র অভিভাবক। একজন মা মুসলিম হলে তিনি সন্তানের অভিভাবক হওয়ার অধিকার পান না। তবে ২০১৮ সালে ঢাকার ১২তম জেলা ও সেশন আদালতের সহকারী জজ এক ব্যতিক্রমী আদেশে বাংলাদেশি মডেল ও অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনকে তার কন্যার শুধু প্রতিপালন নয়, বরং সম্পূর্ণ অভিভাবকত্ব প্রদান করেছেন।[৪] সুপ্রিম কোর্টের অনেক আদেশে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, যেখানে সন্তানের কল্যাণের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগত আইনের বাইরে গিয়ে সন্তান প্রতিপালনে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও ব্যক্তিগত আইনের বৈষম্যমূলক বিধানের ব্যাপারে গুরুতর উদ্বেগ রয়ে গেছে (যেমন, মুসলিম আইনের বিধানে বলা আছে- নারী যদি পুনরায় বিয়ে করেন, তাহলে সন্তান প্রতিপালনের অধিকার হারান; অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়)। এছাড়াও আইনের

[৪] বাঁধন তার মেয়ে সায়রার অভিভাবকত্ব পেয়েছেন। (২০১৮, এপ্রিল ৩০)। ঢাকা ট্রিবিউন।
https:// www.dhakatribune.com/showtime/2018/04/30/badhon-receives-guardianship-daughtersaira

বৈষম্যমূলক প্রয়োগ ঘটে। সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে বিবাদের ক্ষেত্রে নারীর চরিত্র নিয়ে তার স্বামী প্রশ্ন তোলেন। এর পাশাপাশি নারীর ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে গৎবাঁধা ধারণা পোষণ করা হয়।

১০. বিউটির ঘটনা

যদি পুলিশ হস্তক্ষেপ করার আগেই মেয়েশিশুর বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? এই বিয়ে কি স্বীকৃতি পাবে, যেহেতু বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ?

২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ করানো বা অংশগ্রহণ করা একটি অপরাধ (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ধারা ৭ ও ৯)। যদি পুলিশ হস্তক্ষেপ করার আগেই কোনো মেয়েশিশুর বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যারা এই বিয়ের আয়োজন করেছেন বা বিয়ে পড়িয়েছেন (পিতা-মাতা, কাজী) অথবা যারা অংশগ্রহণ করেছেন (প্রাপ্তবয়স্ক বর), তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে পুলিশের কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রয়োজন নেই (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ধারা ৯ ও ১৪)। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ৮ নম্বর ধারার আওতায়, বাল্যবিবাহের সাক্ষীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনার সুযোগ রয়েছে। আইনের এই ধারায় বলা আছে- বাল্যবিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত পিতা-মাতা, অভিভাবক, বা 'অন্য যে কোনো ব্যক্তির' শাস্তি প্রাপ্য, যদি 'বিয়ের সাক্ষী হওয়াটা' বিয়ে সম্পন্ন করার একটি কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যদিও বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা এতে অংশগ্রহণ করা একটি অপরাধ (এমনকি কনেশিশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ধারা ৭ ও ৮); কিন্তু বর-কনের ওপর প্রযোজ্য আইনের ওপর নির্ভর করে বিয়ে বৈধ থেকে যেতে পারে। বিয়ে বৈধ মানে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে এবং সন্তান ভরণপোষণের অধিকার দাবি করতে পারেন। যদি বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তা অবৈধ হয়ে যায়, তাহলে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া সকল নারী নিজেদের ভরণপোষণ এবং তাদের সন্তানের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুরক্ষা পাবেন না।

১১. কমলার ঘটনা

স্বামীর হুমকি: যদি কোনো নারীকে তার স্বামী সহিংসতার হুমকি দেন, তাহলে তিনি থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে পারেন (সিআরপিসি, ধারা ১৫৪ ও ১৫৫)। কিন্তু যদি আদালতে ইতোমধ্যে কোনো মামলা চলমান থাকে এবং এর মধ্যেই বিচারকার্যে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বামী হুমকিস্বরূপ স্ত্রীকে কোনো ভিডিও বা রেকর্ডিং পাঠিয়ে প্রমাণ বদলাতে চাপ প্রদান করেন, তাহলে স্ত্রী তার ব্যক্তিগত আইনজীবীকে (ফৌজদারি শুনানির ক্ষেত্রে সরকারি কৌঁসুলিকে) হুমকির ব্যাপারে অবহিত করতে পারেন এবং আইনজীবী তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আইনজীবী তখন এই মামলার শুনানির অংশ হিসেবে আদালতকে হুমকির ব্যাপারে অবহিত করতে পারেন। তবে ভিডিওতে যদি সহিংসতার হুমকিস্বরূপ কিছু না-ও থাকে, কিন্তু সেগুলো যদি অবমাননাকর

বা হয়রানিমূলক হয়, তবু এটি পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেই নারী পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের আওতায় সুরক্ষা চাইতে পারেন।

১২. দিলরুবার ঘটনা

কাজীর খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ: সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মধ্যস্থতা পরিচালনা করেছিলেন। দেনমোহরের টাকা বাবদ স্ত্রী ষাট হাজার টাকা দাবি করেছিলেন। কিন্তু তার স্বামী বা সাবেক স্বামী পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিতে রাজি হন। এই টাকার পরিমাণ থেকে আবার কাজীর খরচ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সাধারণত খুলা তালাকের ক্ষেত্রে দুই পক্ষই তালাক নিবন্ধনের খরচ বহন করে থাকেন। সেজন্য এক্ষেত্রে দেনমোহরের টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয় স্ত্রীর অবদান হিসেবে।

স্ত্রীর ফিরে আসা: সাধারণত কাবিননামায় নির্দেশিত যে ফরম রয়েছে, সেখানে কনের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে হয়, যেমন তিনি কুমারী, বিধবা, নাকি তালাকপ্রাপ্ত [বিধি ২৭ (১)(ক) কলাম ৫, ফরম 'ঘ', ২০০৯ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধির শিডিউলে লিপিবদ্ধ]। তবে ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (রিট পিটিশন নম্বর ৭৮৭৮, ২০১৪) মামলায় উচ্চ আদালতের আদেশে কাবিননামায় 'কুমারী' শব্দের পরিবর্তে 'অবিবাহিত' শব্দ প্রতিস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। কাবিননামায়, বরকে নির্দিষ্ট করে বলতে হয় তার কোনো বিদ্যমান স্ত্রী রয়েছে কি-না (একই ফরমের ২১ নম্বর কলাম)।

দিলরুবার ঘটনায়, দ্বিতীয় বিয়ের পরের দিন স্বামীর প্রথম স্ত্রী তার শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসেন, যদিও স্বামী তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলেছিলেন তার প্রথম স্ত্রী আর কখনোই ফিরে আসবেন না। প্রথম স্ত্রীকে বিতাড়িত করতে দ্বিতীয় স্ত্রী কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। কারণ দাম্পত্য অধিকারের মধ্যে একটি হলো স্বামীর সঙ্গে বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার।

১৩. রেশমার ঘটনা

বিয়ে টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে দেনমোহরের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা: বিয়ে টিকিয়ে রাখতে অনেক কৌশলের মধ্যে একটি হলো স্ত্রীর আইনজীবী পারিবারিক মামলায় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখান, যার মধ্যে রয়েছে দেনমোহর, অতীতের ভরণপোষণের খরচ এবং 'ক্ষতিপূরণমূলক ভরণপোষণ'। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যেসব আইন দ্বারা বিয়ে ও তালাকসংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিচালিত হয়, সেখানে এ ধরনের ভরণপোষণের কোনো বিধান নেই। পারিবারিক মামলায় এসব দাবি করা হয় কৌশল হিসেবে। বিজ্ঞ আইনজীবীরা এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের দাবি জানান যখন একজন নারীর স্বামী দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করেননি কিংবা সংসার জীবনে স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ বহন করেননি। এমন পরিস্থিতিতে যখন

ভরণপোষণের দাবি জানানো হয়, তখন বিজ্ঞ আইনজীবীরা বকেয়া অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ দাবি করেন, যেন স্ত্রীর যত অপ্রাপ্ত ভরণপোষণ রয়েছে সবকিছুর 'ক্ষতিপূরণ' হয়। ধারণা করা হয়, যদি এত বড় অঙ্কের টাকা স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হয়, তাহলে হয়তো স্বামী বিয়ে ভেঙে দিতে চাইবেন না। বরং চাইবেন স্ত্রীর সঙ্গে সমঝোতা করতে। সাধারণত আমরা যেসব আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মতে, প্রায়ই স্বামী স্ত্রীকে আগে ঘর থেকে বের করে দিয়ে থাকলেও তার সঙ্গে সমঝোতা করে নিজ বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করেন। এর মাধ্যমে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বিপুল টাকা পরিশোধ করার দায় এড়াতে চেষ্টা করেন। এই কৌশলকে সফল হিসেবে মনে করা হয়, কারণ এর ফলে বিয়ে টিকে থাকে। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীকে কী পরিস্থিতি সহ্য করতে হয় বা পারিবারিক সহিংসতা অব্যাহত থাকে কি-না, তার কোনো প্রমাণ নেই।

...